কে?

গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া ... 'ভক্তের ভগবান' গল্পটি আমার কন্যা শ্রীমতী রেণুকার ... অবশ্য আমি দেখিয়া দিয়াছিলাম। 'খোকাখুকু'তে গল্পটি বাহির হইয়াছিল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সূচী পত্র

বিবি বউ

১

সুপ্রভার বিবাহে বড়ই গোল বাধিল। তাহার জ্যেষ্ঠতাত বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার। তিনি যদিও পৃথক বাড়ীতে থাকিতেন, তথাপি বিবাহ-সভায় তাঁহাকে আসিতে বলিল কে? বরপক্ষ এই আপত্তি তুলিয়া সভা হইতে বর উঠাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদেরও যে বিশেষ দোষ দেওয়া যায়, তাহা নহে। তাঁহারা ত গোড়াতেই বলিয়াছিলেন যে বিলাত ফেরতের সংস্রব থাকিলে তাঁহারা একাজ কিছুতেই করিবেন না। সুপ্রভার পিতা বিহারী বাবু তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলেন যে, তাঁহার দাদা এ বিবাহে থাকিবেন না; তাঁহারা একান্নভুক্ত নহেন এবং দাদার সহিত তাঁহার কোনও সংস্রব নাই। বরপক্ষ যখন নানা মিষ্ট বচনের মধ্যে এই কথাটীরই বারংবার উল্লেখ করিতে লাগিলেন, তখন বিহারী বাবু মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন এবং মিঃ চ্যাটার্জ্জি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

পাত্রটি সুরূপ, সদ্বংশজাত ও বিদ্বান; কাজেই কন্যাপক্ষের আকিঞ্চন সহজে অনুমেয়। কিন্তু পাত্রের পিতা যখন বলপূর্ব্বক পাত্রকে সভাস্থল হইতে টানিয়া লইয়া চলিলেন, তখন একটা

অপমানের তরঙ্গ কন্যাপক্ষের মস্তকের উপর দিয়া অতি নির্ম্মম ভাবে বহিয়া গেল। মিঃ চ্যাটার্জ্জি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে ব্যাপারটা তাঁহার উপর বাক্যবাণ বর্ষণেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কোনও সভ্য সমাজে ব্যাপার যে এতদূর গড়াইতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। বরপক্ষ যখন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত রাস্তা দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেলেন, তখন মিঃ চ্যাটার্জ্জির চক্ষু দিয়া অগ্নির জ্বালা বাহির হইতেছিল। তিনি সহোদরের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে বিবাহের সমস্ত উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম্মেই রত ছিলেন না।

বিহারীবাবুকে অন্তরালে আনিয়া তাঁহার দুইটি হস্ত আপন হস্তদ্বয়ের মধ্যে লইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "বিহারী, অপরাধ আমারই।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। কিন্তু বিহারী বাবু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুর ধারা ছুটিল—তাহাতে ক্রোধ, লজ্জা ও ক্ষোভ সকলই মিশানো ছিল। তিনি সবলে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জি সে বেদনার তীব্রতা অনুভব করিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন; বুঝিলেন, ভাইয়ের মনের অবস্থা তখন মার্জ্জনা করিবার মত নহে। আর কিছুই সেখানে তাঁহার করিবার নাই দেখিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

বিহারী বাবু একেবারে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে একেবারে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। এ বিবাহে তিনি দাদাকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করেন নাই। কিছুদিন হইতে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মনের মিল না থাকায়, মিঃ চ্যাটার্জ্জির হঠাৎ অনাহূত ভাবে আবির্ভাব বিহারী বাবুর কল্পনার মধ্যেও আসে নাই।

পূর্ব্বে দুই ভাইয়ে যখন একত্র থাকিতেন তখন এই বিলাত-ফেরত-সংসর্গ কন্যার বিবাহের প্রতিকূল হইবে, এমন কথা বিহারী বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই হইত। সেজন্যও বটে, এবং অন্য কারণেও বটে, বিহারী বাবু ভ্রাতার স্নেহ বন্ধন কাটাইতে মনস্থ করিলেন। সুপ্রভা যেমন বড় হইয়া পড়িতে লাগিল, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের বিরক্তির ভাব তেমনই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। গতিক বুঝিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি একেবারে টালা হইতে টালিগঞ্জে গিয়া স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিলেন। মাঝে যে দীর্ঘ দুইটি বৎসর কাটিয়াছে, তাহাতে দুই ভাইয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমে বাড়িয়াই গিয়াছে। কিন্তু আজ সুপ্রভার বিবাহে মিঃ চ্যাটার্জ্জি অনেক চেষ্টা করিয়াও গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন নাই। তিনি নিজে অকৃতদার; বড়ই স্নেহে ও সোহাগে সুপ্রভাকে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন। আজ ভাই তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি কি বলিয়া সুপ্রভাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া পারেন? তিনি সকাল সকাল কোর্ট সারিয়া, লাভ চাঁদের বাড়ী হইতে নেকলেস্, ব্রোচ ও ব্রেসলেট, বড় বাজার হইতে

ঢাকাই, রেশমী ও বেনারসী শাড়ী এবং বৌবাজার হইতে প্রচুর মিষ্টান্ন ও ফুল লইয়া সুপ্রভাকে সন্ধ্যাকালে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। এ অভাবনীয় ব্যবহারের জন্য বিহারী বাবু একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। এখন হঠাৎ আধ ঘণ্টার মধ্যে এই যে ঘটনাটি ঘটিয়া গেল, তাহাতে তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল।

এমন সময় উত্তেজিত স্বরে কথা কহিতে কহিতে, একেবারে দশ বার জন লোক সে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে প্রায় শূন্যের উপর দিয়া সে বিছানা হইতে মেজের উপর এবং মেজে হইতে দ্বার দেশে এবং সেখান হইতে উঠানে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহারা সকলেই এক সঙ্গে কথা কহিতেছিল সুতরাং বিহারী বাবুর তৎকালীন মনের অবস্থায়, তাহাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইল। ততক্ষণ রমণীর দল ও উঠানে আসিয়া জুটিয়া গেলেন এবং বিহারী বাবু কোনও অভিমত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহারা বিচার বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত-স্থির করিয়া রায় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাপার এই, বিহারী বাবুর সম্পর্কে মামাতো ভাই নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যামিনীকান্ত অদ্য অকূলের কাণ্ডারী ও সুপ্রভার বরপাত্র রূপে বিদ্যমান, এখন মাত্র সম্প্রদানের অপেক্ষা। জাতির দায়, চিন্তার অবসর নাই—লগ্ন বহিয়া যায়!

বিহারী একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। বোধ হয় একবার দাদার সেই অশ্রুসজল মুখখানি তাঁহার নয়নদ্বয় কেবল

খুঁজিয়া বেড়াইল। এ বিপদে দাদা থাকিলে বোধ হয় সুপরামর্শ দিতে পারিতেন। সুপ্রভাকে তিনি যেমন ভাল বাসেন, আর কি কেহ তেমন বাসে?

বিবেচনার বিষয় অনেক ছিল। যামিনীকান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। সেই কার্য্যটি করিতে তাহার দুই যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন সে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ে কিংবা কমার্শ্যালে পড়ে, তাহার প্রকৃত সংবাদ কেহ রাখে না। নিশা-নাথ বাবুর বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। তবে পাত্রটি দেখিতে মন্দ নয়; সুস্থ, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান এই যা'।

বিহারী বাবুকে অন্যমনস্ক দেখিয়া নিশানাথ বাবু একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "বেহারী, তোমার জাত আমার জাত একই কথা ভাই। আজ তোমার জাত যায় দেখে নিশ্চিন্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই পাঁচজনের কথায় আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছি। তোমার যদি 'ইতস্ততঃ' থাকে তবে ওকথা এখন থাক, পরে ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে যা' হয় করা যাবে, সেই ভাল, কি বল?"

বিহারী সে অনুযোগের স্বরে চমকিত হইলেন। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ নিশ্বাস রোধ করিয়া তাঁহার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, দেখিতে পাইলেন। তিনি মনঃস্থির করিয়া ফেলিলেন ও নিশানাথ বাবুর হাত দুই হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ যে উপকার করলে, চিরকাল তা' স্মরণ থাকবে।"

নিশানাথবাবু গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "সে কি কথা! এ ত আপনা আপনি। তুমি কি আমার পর, বেহারী? তোমার

জন্যে যদি এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে না পারি, তবে ত সকলই বৃথা। আমি ঐ পাড়াগেঁয়ে ভূতদের মত সমাজকে ভয় করিনে। তুমি দেখো, ঐ অসভ্য জানোয়ারদের সঙ্গে কাজ না করে তুমি ঠকেছ কি জিতেছ, বুঝ্‌লে ভায়া? ছেলেটা এম্ এ পাশ করেছে বলেই আমাদের যা আকিঞ্চন ছিল। তা' আজকাল এম্ এ পাশ রাস্তা ঘাটে গড়াগড়ি যায়। আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার ভূতোও না হয় দু' বছর বাদে এম্ এ পাশ করে বেরিয়ে আস্‌বে। তখন বুঝে নিও ভায়া।"

"তা বটেই ত! তা বটেই ত" বলিয়া সকলে সমর্থন কবিলেন।

ভূতো ওরফে যামিনীকান্ত ছাদে জলপানের খুরি সাজাইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উঠানে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপারটা তখনও পরিষ্কার ভাবে তাহার কানে পৌছায় নাই। প্রাঙ্গণে ললনাকুল যখন শাঁখ বাজাইয়া উঠিলেন এবং তাহার দু' চারিজন সমবয়স্ক তাহাকে প্রায় কাঁধে তুলিয়া লইয়া গিয়া চেলি পরাইতে ও চন্দনের ফোঁটা কাটিতে লাগিয়া গেল, তখন সে হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সুপ্রভার বিবাহে আজ সে পিঁড়ি ধরিয়া সাতপাক ঘুরাইবে, বলিষ্ঠ যুবক সুপ্রভার সহিত এই বন্দোবস্তটাই শুধু করিয়া লইয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে সেই পিঁড়িতে বসিয়া সুপ্রভার পাণিপীড়ন করিতে হইবে, কোন্ দুষ্ট বিধাতা কল টিপিয়া এই খেলা পাতিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন, তাহা সে কোনও মতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

রসুনচৌকী আবার সানাইয়ে আশাবরীর তান ধরিল।

২

'ভূতো দা' যখন একেবারে মহামহিমান্বিত স্বামি[illegible] হইলেন, তখন সুপ্রভার মনের ভাব কি হই[illegible] ইতিহাস এক অন্তর্য্যামী ভিন্ন কেহই [illegible] প্রথম স্বামিগৃহে আসিয়া মস্ত বড় একটা ছা[illegible] সংসারে নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া রহিল। স[illegible] মেয়ের যে বয়সে বিবাহ হয়, সুপ্রভার বয়স তাহা অতি[illegible]রিয়াছিল। সুতরাং তাহাব যা, ননদ হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়ার রামী শ্যামী পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জ্জর করিয়া তুলিল। তারপর সে লেখাপড়া জানে, ইংরেজী বাঙ্গালায় তাহার অভিজ্ঞতা আছে—এ খবর রটিতেও বিলম্ব হয় নাই। বেথুন কলেজে পড়া মেয়ে, বিলাত ফেরতের ভাইঝি—পিয়ানো বাজানো, ছবি আঁকা হয়ত বা গাড়ী হাঁকাইতে অভ্যস্তা—ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে আর বাকী কি? সকলেই তাহার উপর বিরূপ হইয়া রহিল।

সুপ্রভা বুঝিতে পারিল না তাহার অপরাধটা কোনখানে। তাহার জ্যাঠা মহাশয় যে তাহাকে এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইলেন, সে সবই কি ভুল? সে মনে করিল যে, তাহার বিদ্যাটা ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার মত জিনিষ নয়! লেখাপড়া শিখিয়া যদি সে অন্যায়ই করিয়া থাকে, তবে সে অন্যায় ত মুখের কথায় রহিত হইতে পারে না। কাহারও ফরমাস মত যে নিজেকে গড়িয়া ফেলা যাইতে পারে, ইহা ত তাহার জ্ঞান-গোচরে এ পর্য্যন্ত আসে নাই। সুতরাং সে

...আলোচনায় নিজের উপর আস্থা হারাইল না। তাহার ... কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, তবুও সে বিশ্ব... অন্ধকারের মধ্যে আলো, জীবনের সকল জিনিষে ...।

সুপ্রভা... নাই, সংসারে সে আর তার বিধবা মা। ননদ বিবাহো... আসিয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি তাহাকে ... ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া শ্বশুরাবাসে চলিয়া গেলেন। তিনি ... কের বধূ, ইচ্ছা করিলে ভাল মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের ... পারিতেন; তাঁহার পিতা কুক্ষণে এই অলক্ষুণে বিবি ... আনিয়াছেন, এ সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে—এই ... ভবিষ্যৎবাণী করিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। সুপ্রভা ... সব শুনিল এবং পরক্ষণেই তাহার বাক্স হইতে ... বাহির করিয়া লইয়া জানালার কোণে গিয়া বসিল।

অদৃষ্ট যখন বৈশাখের সায়াহ্ন মেঘের মত অন্ধকার করিয়া আসিত, তখন সে টেনিশনের কবিতা, বার্ণসের কবিতা অথবা দেশী বিলাতী ম্যাগাজিনের গল্প পড়িতে বসিত। দুঃখ ভুলিবার জন্য, সান্ত্বনা লাভ করিবার জন্য, সে পুঁথির স্মরণ লইত। এই নিঃসঙ্গ ও নিরবলম্ব জীবনে যখনই সঙ্গীর জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত, তখনই সে তাহার অল্প কয়েকখানি গ্রন্থকে যেন সবলে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিতে চাহিত। ননদ চারুবালা যেদিন গৃহতলে অলক্তক চিহ্ন ও সুপ্রভার হৃদয়ে দারুণ অভিসম্পাতের

শোণিতারুণ রেখা রাখিয়া চলিয়া গেল, সেইদিন হইতে [illegible] জীবন যেন আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। সকলে [illegible] বিরক্তির চোখে দেখিতে লাগিল।

একদিন তাহার শ্বশুর স্পষ্টই ব[illegible], অত বিবিয়ানা আমাদের এ হিন্দুর বা[illegible] না। সেদিন নিতান্ত তোমার বাবার জাত যা[illegible]কে ঘরে এনেছি। কিন্তু ওসব অনাসৃষ্টি অনা[illegible]ব না বাপু! পড়াশুনা নিয়ে থাকতে হয়, [illegible] সেজে বই নিয়ে মুখ গুঁজে থাকতে চাও [illegible] গিয়ে থাক। আমার এখানে ওসব বে[illegible]

[illegible] এইবারে বই রাখিয়া উঠিল এবং বিছানা [illegible] উপলক্ষ করিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। [illegible] দয়া করিয়া যাহারা গৃহে আনিয়াছে, পায়ে স্থান দিয়াছে, তাহাদের উপর ত রাগ করা চলে না। এতই ঘৃণার সামগ্রী সে! তাহার চোখে জল আসিল। একজন তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারিত, তাহাকে বলিয়া দিতে পারিত যে, সে নিতান্ত হেয় নয়; সে তাহার স্বামী। কিন্তু চির পরিচিত 'ভূতো দা' স্বামী হইয়া প্রায় অপরিচিতের মত হইয়া পড়িতেছিল। এ ক'দিন তাহার বড় একটা দর্শনই পাওয়া যাইত না। পাড়ায় তাহাদের সখের নাট্যসমাজে আজ ক'দিন জোর রিহার্সেল চলিয়াছে। যামিনীকান্ত তাহার বিশ্রামের সময় পর্য্যন্ত পাইতেছিল না। একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে নাটকের কথাটা তুলিয়া

যখন দেখিল যে তাহাতে সুপ্রভার হৃদয় ঠিক গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, তখন সে নিতান্ত বারিবিচ্ছিন্ন মীনের মত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল।

যামিনী জানিত, সুপ্রভার বিদ্যার কাছে তাহাকে মাথা নত করিতে হইবে। সে বেশী দিন কিছু তাহার অজ্ঞতা চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। একদিন না একদিন স্ত্রীর নিকটে তাহাকে অবজ্ঞার পাত্র হইতেই হইবে। এই আশঙ্কায় তাহার স্বাভাবিক পৌরুষাভিমান বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। স্ত্রী জাতিকে যতই সম্মানের চক্ষে আমরা দেখি না কেন, পুরুষের হৃদয়ে এমন একটি আভিজাত্যের গৌরব আছে যে তাহাতে আঘাত লাগিলে সে কোনও ক্রমেই সহিতে পারে না। যামিনীকান্ত এই বিদুষী বধূকে গৃহে আনিয়া কেবলই আশঙ্কা করিতে লাগিল যে তাহার পরীক্ষার অপ্রিয় মুহূর্ত্ত ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বাঙ্গালা এবং ইংরাজী উভয় ভাষাতেই তাহার জ্ঞান মূর্ত্তিমন্ত। সুতরাং কথা কহিতে গেলেই ত ধরা পড়িয়া যাইবে। তাহাদের থিয়েটারে যে "জনার" অভিনয় হইবে, তাহাতে জনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল যামিনীকান্ত। কিন্তু সুপ্রভা যদি তাহাকে জনার কথা গুলি বেশ সুসঙ্গতরূপে ব্যাখ্যা করিতে বলে, তবেই ত গোলমাল বাধিবে। এইরূপ নানা অলীক, অমূলক ও কাল্পনিক আশঙ্কার বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া যামিনীকান্ত প্রায় ফেরার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় সব সময়ে তাহার নাটকীয় আড্ডাই একমাত্র আশ্রয় স্থান হইয়া

দাঁড়াইল। অধিক রাত্রে ফিরিয়া সে যখন শয়ন গৃহে প্রবেশ করিত, তখন প্রায়ই সুপ্রভা ঘুমাইয়া থাকিত। সুপ্রভা যে দিন জাগিয়া থাকিত, সে দিনও যামিনীকান্ত বিনা বাক্যব্যয়ে পাশবালিসটি সজোরে বক্ষে চাপিয়া হাই তুলিতে আরম্ভ করিত। সুপ্রভা একদিন সাহস করিয়া বলিল, "রোজ এত রাত্রি কর্‌লে অসুখ হবে না ত?"

"কিছু না" বলিয়া যামিনী পাশ ফিরিল। তবুও সুপ্রভা ছাড়িল না; বলিল, "দেখ, আমার একলা থাকতে বড় ভয় করে।"

"কেন তুমি ত আর কচি খুকীটি নও।"

রহস্য হিসাবে সুপ্রভা এই কথাটি ঠিক লইতে পারিল না। কেন না, শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া অবধি বয়সের জন্য তাহাকে অনেক খোঁটাই সহিতে হইতেছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। যামিনী বোধ হয় মনে মনে একটু লজ্জিত হইল এবং একটু শোধরাইয়া লইবার জন্য বলিল "তুমি ত ততক্ষণ বই পড়েই বেশ কাটিয়ে দিতে পার!"

যামিনী ভাবিয়াছিল যে কথাটি সুপ্রভার মনোমত হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে কতখানি বেদনা ও অভিমান সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার কোনও খোঁজই সে রাখিত না। সুপ্রভা শুধু একটু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে ভাবিল, লেখা পড়া শিখিয়াছে বলিয়াই, তাহার যত অপরাধ! সুপ্রভা আর কোনও কথা বলিল না দেখিয়া যামিনীও ক্ষুণ্ণ হইল। সে মনে করিল,

এ সব বিলাতী ধরণের মেয়েদের অন্ত পাওয়া ভার। নিজ গ্রহ ও অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সুপ্রভা দেখিল তাহার বইয়ের বাকসটি অদৃশ্য হইয়াছে। সে উঠিবার পূর্ব্বেই তাহার স্বামী দ্বার খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন। কাজেই সে প্রথমতঃ বুঝিতে পারিল না, যে অন্য বাক্সের বদলে ভুল ক্রমে তাহার বাকসটি তিনি লইয়া গিয়াছেন, অথবা অন্য কেহ বাক্সটি সরাইয়াছে। তাহার অপর বাক্স যাহাতে মূলবান বস্ত্র ও অলঙ্কার ছিল তাহা স্থানচ্যুত হয় নাই, অথচ বইয়ের বাক্সটি যে স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল সেই স্থানটিই শূন্য। গৃহ কর্ম্মের অবসরে সদর ও অন্দরের সর্ব্বত্র খুঁজিয়া যখন কোথাও সে বই ও বাকসের এতটুকু চিহ্ন মিলিল না, তখন তাহার মন দুঃখ অপেক্ষা চিন্তার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িল; যাহারা এমন করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার ষড়যন্ত্র করিতে পারে, তাহাদের সঙ্গে কেমন করিয়া সে বনাইয়া থাকিবে, এই চিন্তায় সে হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার বিবাহিত জীবনের একটি মাস সবে কাটিয়াছে, ইহারই মধ্যে যদি এমন ঘটিল, তবে দীর্ঘ জীবন এত অনাদর অবহেলায় কেমন করিয়া কাটিবে, তাহাই ভাবিয়া সে আকুল হইল। যেখানে আদর পাইবার আশা থাকে, সেখানে উপেক্ষা, লাঞ্ছনা, অবমাননা পাইলে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে।

৩

সুপ্রভা ছুটি পাইয়াছে। সে শ্বশুর বাড়ীতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঠিক বিদ্রোহ না করিলেও, তাহার মন যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, একথা কাহারও জানিতে বাকী ছিল না। সেজন্যও বটে, এবং আর একটি ঘনায়মান সংশয়ের জন্যও বটে, তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সংশয়টি আর কিছু নহে,—যামিনী বধূর প্রতি বিমুখ হইয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়াই নিশানাথ বাবু সুপ্রভাকে রওনা করিয়া দিয়াছেন। সেও যে ইহা বুঝিতে পারে নাই, তাহা নহে; তথাপি আশা মানুষকে নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। সুপ্রভা ভাবিয়াছিল, হয়ত তাহার ভুল হইয়াছে। হয়ত শ্বশুর বাড়ীতে তাহার একটি আশ্রয়স্থান সে কোনও মতে রচনা করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু যখন মাসের পর মাস অতীত হইতে চলিল, অথচ কেহই তাহাকে লইবার জন্য যত্ন করিল না, কেহই তাহাকে একটি স্নেহ-সম্ভাষণ দিয়া শুধাইল না, তখন সে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করিল। ভাবিল যে, বিধাতাও তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন! সে যে অত্যাচার লাঞ্ছনা পাইয়া আসিয়াছিল, তাহা সে ভুলিয়া গেল। তাহার বই পড়ার আগ্রহ কমিয়া গেল। মন অনেক সময় তাহার সেই অনাদর-ম্লান দিনগুলির স্মৃতি অতি আদরের সহিত আলোচনা করিয়া কাটাইত।

তাহার পিতা তাহাকে আগের মত আর সময়ে অসময়ে

ডাকিতেন না। এখন সে সম্মুখে গেলেই, তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ মেঘখণ্ডের মত জলভারাবনত হইয়া পড়ে। সেইজন্য সেও বড় কাছে ঘেঁসিতে চাহিত না। বিহারীবাবু যে তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জিত, তাহা সে না বলিলেও বুঝিত। তাহার জ্যাঠামহাশয়ের সহিত এই বিবাহ লইয়া মনোমালিন্য যে আরও বাড়িয়াছে সে কথাও তাহার শুনিতে বাকী নাই। জ্যাঠামহাশয় তাহার জন্য দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার সাধের পুত্তলিকে যাহারা এমন করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে, জীবনে তিনি আর তাহাদের মুখদর্শন করিবেন না। "আজ হইতে আমি মনে করিব সুপ্রভা মরিয়াছে।"—এই কথা বলিয়া তিনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাকে ঘিরিয়া যে একটা অশান্তির দাবাগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, ইহা মনে করিয়া সুপ্রভা মরমে মরিয়া যাইত।

এইরূপে প্রায় বৎসরাধিক কাটিয়া গেল, তথাপি শ্বশুরবাড়ী হইতে সুপ্রভার কেহ খোঁজ লইল না। সুপ্রভার মাতা অনুযোগ জুড়িয়া দিলেন, কিন্তু বিহারীবাবু অটল রহিলেন। তিনি অযাচিতভাবে কন্যাকে কিছুতেই পাঠাইবেন না। একবার যে ভুল করিয়াছেন, সারাজীবন তাহার জন্য অনুতাপ করাই যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তবে সে ভুল আবার করিয়া কাজ নাই।

কিন্তু সুপ্রভা এ সমস্যার একটি সহজ সমাধান করিয়া দিল। একদিন সে তাহার বাবার কাছে গিয়া বলিল যে সে

আজ বৌবাজার যাইবে। বিহারীবাবু আফিসের কাপড় পরিতেছিলেন গড়গড়ার নল তাঁহার হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। তিনি সভয় বিস্ময়ে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুপ্রভা একখানি পত্র তাহার পিতাকে দেখাইল। সে পত্রে তাহার যা শ্বশুরের জীবন-সংশয়কর পীড়ার সংবাদ দিয়াছে এবং শেষ দেখা দেখিবার জন্য যাইতে লিখিয়াছে। বিহারীবাবু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "ভূতো ত যেতে লেখে নি।" সুপ্রভা বলিল, "নাই বা লিখ্‌লেন; ব্যারাম ত হয়েছে ঠিক! সেইজন্যে বোধ হয় লেখ্‌বার অবকাশ হয় নি। আমায় যেতে হবে, বাবা।"

এ কথার উপর আর কথা চলে না। বিহারীবাবু তৎক্ষণাৎ চাকরকে গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন। গৃহিণী কন্যার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুছাইতে বসিলেন। সুপ্রভা তাঁহাকে বিরত হইতে বলিয়া একটি তোরঙ্গে মাত্র খান কয়েক কাপড় লইয়া গাড়ীতে উঠিল। গহনার বাক্সটিও লইতে ভুলিল না।

৪

সুপ্রভা আসিয়া দেখিল শ্বশুরের জীবনবর্ত্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কয়েকদিন রাত্রি জাগিয়া তাহার যা পাশের ঘরে একটি মাদুর বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বামী অফিসে চলিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলেন মুমূর্ষু পিতার

পার্শ্বে সুপ্রভা বসিয়া আছে। সুপ্রভার সে মূর্ত্তিটি তাহার চোখে বড়ই সুন্দর দেখাইল। বিরলাভরণা, নাতিশুক্লবসনা, করুণার্দ্রনয়না এই শুশ্রূষাকারিণী তাহার স্ত্রী হইলেও হইতে পারে। এতদিন সে কেবল স্ত্রীর সৌখীন বেশবিন্যাসকুশলা, পাণ্ডিত্যাভিমানিনী মূর্ত্তিই মনে মনে কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এমন একজন রমণীকে লইয়া "ঘর করা" একান্ত অসম্ভব—বিশেষতঃ তাহার মত 'মুখ্‌খু সুখ্‌খু' ব্যক্তির পক্ষে। কুলীনের পক্ষে দ্বিতীয় দারে বাধা নাই—এতদিন সে চেষ্টাও যে একেবারে হয় নাই তাহা নহে। তবে বিলাত ফেরতের বাড়ীতে ক্রিয়া করার জন্য যেটুকু দোষ স্পর্শিয়াছিল, তাহার জন্য অনেক কন্যা-সম্প্রদানেচ্ছু হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ সুপ্রভাকে দেখিয়া যামিনীকান্তের লজ্জা উপস্থিত হইল।

সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুপ্রভা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা এখন ঘুমুচ্ছেন, তুমি কাপড় ছেড়ে হাতে মুখে জল দিয়ে এসো গে।"

যামিনীকান্ত কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে জড়সড় হইয়া বসিল এবং সুপ্রভার শুশ্রূষা-তৎপরতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নিশানাথ একটু চৈতন্যলাভ করিয়া যামিনী-কান্তকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি কি ছোট বৌমাকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলে ?"

যামিনীকান্ত উত্তর করিল, "না"।

নিশানাথ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে আজ হঠাৎ এদের মনে পড়ল যে। তা বেশ ত! তোমার ঘরকন্না এখন তোমারই বুঝে নেওয়া ভাল, আমি ত যেতে বসেছি।"

সুপ্রভা মাথা হেঁট করিল, কিন্তু শ্বশুর ঐ কয়েকটি মর্ম্মান্তিক কথা বলিতে যাইয়া যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তাহাতে সুপ্রভা তাঁহাকে ক্ষিপ্রতার সহিত শুশ্রূষা না করিলে তখনই হয়ত তাঁহার মূর্চ্ছা হইতে পারিত।

যামিনীকান্ত একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল; সে বুঝিল যে সুপ্রভাকে দেখিয়া তাহার পিতা সন্তুষ্ট হন নাই এবং এখন তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিলেও তাঁহার মনে কতকটা শান্তি যে পুনরায় না আসে, তাহা নহে।

যামিনী সে রাত্রি শুধু ঐ শেষোক্ত সংকল্প স্থির করিয়াই কাটাইল। একবার সুপ্রভার বর্ষা-বিধৌত জ্যোৎস্নার মত ম্লান মুখখানির কথা মনে পড়িতে লাগিল, আবার তাহার পিতার মুমূর্ষু অবস্থার স্পষ্ট ইঙ্গিত স্মরণ হইল। পিতার অবাধ্য হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য।

কিন্তু তাহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। নিশানাথের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে দেখা গেল এবং সুপ্রভার অক্লান্ত শুশ্রূষা সত্ত্বেও তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই দেহরক্ষা করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর যামিনীকান্ত স্ত্রীর সহিত ভাল করিয়া

মিশিতে পারিল না। পিতার অন্তিম কালের ইচ্ছা যে সে মানিয়া চলিতে পারে নাই, ইহাই তাহাকে সর্ব্বক্ষণ পীড়া দিতে লাগিল। সে সময়ে যদি সে সুপ্রভাকে তাহার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে পারিত, তবে ত আজ এই অবাধ্যতার অপরাধ এমনভাবে তাহাকে শাস্তি দিত না! কেন সে পারে নাই? পিতার শুশ্রূষার অভাব ঘটিত? কখনই না। সে নিজে এবং তাহার বন্ধু বান্ধবেরা নিশ্চয়ই এ শুশ্রূষার ভার লইতে পারিত। যামিনী আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিল না।

পিতৃশ্রাদ্ধের উপলক্ষে ভগিনী দু'দিনের জন্য আসিয়া 'বিবি-বউকে' উপলক্ষ করিয়া অনেক কথাই শুনাইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভ্রাতাকে সাহায্য করিবার সময় কিন্তু সে অতি সংক্ষেপে জবাব দিয়াছিল, "ওঁর হাতে এখন টাকা নেই। কি করি বল?" পিতার অসুখের সময়ও সে ভগিনীর সাহায্য চাহিয়াছিল, কিন্তু ভগিনী তখন সাহায্য করা দূরে থাক, এদিক দিয়াও মাড়ায় নাই। এখন যামিনী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন প্রাতে হঠাৎ দুঃসপ্নের দোহাই দিয়া ভগিনী সরিয়া পড়িলেন।

এরূপ ভাবে আশ্রয়হীন হইয়া যামিনী বড় হতাশ হইয়া পড়িল।

সুপ্রভা সমস্তই বুঝিল। সে যামিনীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রাদ্ধে কি অনেক লোক বলা হয়েছে?"

যামিনী অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "মন্দ নয়। প্রায় তিন শ হবে।"

সুপ্রভা বলিল, "কাল তিন শ লোকের জলপান দিতে হবে, অথচ আজ এমন করে' চুপ করে' বসে' ভাব্‌লে ত আর জিনিষ-পত্র আপনি এসে ঘরে উঠবে না। এই নাও, আমার এই ক'খানা গহনা কোথাও রেখে তিন চার শ' যা পাও নিয়ে এস। তার পর তখন টাকা হ'লে ঘরের জিনিষ ঘরে নিয়ে এলেই হবে।"

যামিনী কথাগুলি শুনিল, বিস্মিত হইল এবং সজল নেত্রে একবার চাহিয়া দেখিল; একবার মনে বুঝি ঈষৎ সন্দেহও আসিয়াছিল যে, এই স্বার্থত্যাগের অন্তরালে হয়ত গর্ব্ব আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু একবার চাহিয়াই সে বুঝিল যে সুপ্রভার দৃষ্টিতে কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ, কত নির্ভর মাখানো ছিল।

শ্রাদ্ধের ব্যয় এইরূপে নির্ব্বাহিত হইল। যামিনীকান্তের মনের মেঘ কতকটা কাটিয়া গেল। সে লক্ষ্য করিল যে এখন তাহার দিদির "বিবি বউ" ভ্রমেও আর বেশবিন্যাস করে না বা বই লইয়া বসে না। সে নিজে এক সংবাদ পত্রের অফিসে কাজ করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফেরে। আফিস হইতে ফিরিয়া একবার তাহার আড্ডায় যাওয়া চাই-ই। যেদিন যাইতে একটু বিলম্ব হয়, সে দিন ছোকরার দল বাহিরে আসিয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দেয়। "কি হে যামিন্ দা, একেবারে জমে' গেলে নাকি?" "কার্টেন লেক্‌চার শোনা হচ্চে না কি?" ইত্যাদি প্রশ্ন-সম্ভাষণে বেচারীকে বিব্রত করিয়া তোলে। সব সময়ে যে

তাহাতে সুরুচির পরিচয় থাকে, তাহাও নহে। যামিনী লজ্জিত ভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দলে গিয়া মেশে। যখন ফেরে, তখন রাত্রি ১১টা ১২টা বাজিয়া যায়।

যামিনীর মধ্যে মধ্যে মনে হইত যে তাহার স্ত্রীর সময় কাটানো বোধ হয় শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেন না এবার ত বাপের বাড়ী হইতে সে কোনও বইয়ের বাক্স আনে নাই; যে বাক্সটি আনিয়াছে, তাহাতেও বইয়ের চিহ্ন সে দেখে নাই। একদিন প্রভাতে হঠাৎ সুপ্রভা দেখিল তাহার শয়ন গৃহে সেই হারানো বাক্সটি রহিয়াছে—সে বিস্মিত হইল না। সে দিন যামিনী আফিসে গেলে, সুপ্রভা নিজ হস্তে বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া বাহিরের ঘরের আলমারীতে গুছাইয়া রাখিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বাহিরের ঘর ও আলমারী পরিষ্কার করিয়া রাখিল। যামিনী সেদিন ঘরে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল যে লক্ষ্মীর আলপনার মত আজ কাহার করচিহ্ন বাহিরের গৃহটিকে সুশ্রী ও সুশৃঙ্খলা-যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুপ্রভার বইগুলিও যে তাহার অযত্ন রক্ষিত বইগুলির পার্শ্বে স্থান পাইয়া সমস্ত আলমারীটিকে একটি মৌন সৌন্দর্য্যে বিভবযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে—তাহাও যামিনীর দৃষ্টি এড়াইল না।

৫

যামিনী যাহা রোজগার করিত, তাহাতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। সে 'প্রতিধ্বনি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সংবাদদাতার কার্য্য করে। আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া

কৌতুক সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করাই তাহার প্রধান কার্য্য ছিল; অফিসের কার্য্যও কিছু কিছু তাহার করিতে হইত। সে যে কি কাজ করে, সুপ্রভা তাহার খোঁজ লয় নাই। পাছে স্বামীর মনে কোনও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, এই জন্যই সে তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতে বিরত ছিল। কিন্তু সংসার আর কোন মতেই চলে না। অফিসে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও আড্ডায় রাত্রি জাগরণ করিয়া করিয়া যামিনীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার বলিষ্ঠ দেহ আনত হইয়া পড়িল।

সুপ্রভা তাহার নিতান্ত আদরের সামগ্রী লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া গৃহকর্ম্মে একরূপ মনোনিবেশ করিয়াছিল। এমন দিন ছিল, যখন পড়াশুনা কিছু-না-কিছু না করিলে তাহার দিন যেন কাটিত না। সে নেশা সে হেলায় পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু আবার একি বিপদ! স্বামী অসুস্থ হইয়া পড়িলে, সে কেমন করিয়া বাঁচিবে? সে ভাবিত হইল।

যামিনী স্ত্রীর কাছে পরীক্ষা দিতে হওয়ার আতঙ্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মানসিক দৈন্য তাহাকে এখনও লজ্জা দিতে ছাড়ে নাই। সে ভাবিত, তাহার স্ত্রী বোধ হয় কোনও বিদ্বানের হাতে পড়িলে সুখী হইতে পারিত। তাহার মত একজন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত স্বামীর হস্তে পড়িয়া যে এমন বিদুষী রমণী চিরকাল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে বাধ্য—ইহা সে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেই জন্য স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান যেন কিছুতেই ঘুচিল

না। মনের যে স্বাভাবিক আদান প্রদানে উভয়ে উভয়ের জীবনকে সরস ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত, তাহার একান্তই অভাব ঘটিয়াছিল। যামিনী অসুখের কথা পর্য্যন্ত স্ত্রীকে খুলিয়া বলিতে পারিল না।

একদিন সুপ্রভা তাহার যা'কে বলিল, "দিদি, আমার ত ভাই ভাল বোধ হচ্চে না। একজন ভাল ডাক্তারকে দেখালে হ'ত না?"

সুপ্রভার ছল ছল অনুনয় পূর্ণ চোখ দুটিতে যে কি আশঙ্কা ও আবেগ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাহার যায়ের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে অনাথা বিধবাকে এরই মধ্যে সুপ্রভা একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। তিনি সুপ্রভার কথায় দু' এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন; বলিলেন, "ডাক্তারে ঠাকুরপোর অসুখ সারতে পারবে না, বউ! আর তারই বা টাকা কোথায়?"

যায়ের কথায় সুপ্রভা চক্ষু বিস্ফারিত করিল। তিনি যে কেন এ কথা বলিলেন সুপ্রভা তাহা বুঝিতে পারিল না। সুপ্রভার মৌন প্রশ্ন তাহার যা বুঝিতে পারিলেন; তিনি বলিলেন, "বুঝতে পাচ্ছ না? কাঁচা বয়সে সংসারের চাপে বেচারী শুকিয়ে যাচ্ছে। টাকার অভাবেই ওকে পাগল ক'রে দিলে। তোমার গয়না গুলি ছাড়িয়ে আনতে পারে নি বলে বেচারী মুখ দেখাতে লজ্জিত হয়। তার পরে কি ক'রে সংসার চলবে, সেই ভাবনায় ভাবনায় ও ব্যামো করে ফেলেছে। ভগবান না বাঁচালে আমাদের আর উপায় নেই, বউ।"

সুপ্রভা বলিল, "কেন, উনি যা আনছিলেন তাতে ত সংসার বেশ চলে যাচ্ছিল!"

মা বলিলেন, "হা পোড়া কপাল, ওকে কি আর বেশ চ'লে' যাওয়া বলে? সেই চিন্তাই ত ওর সর্ব্বক্ষণ; বলে বাবা একটা বে' দিয়ে গেলেন, অথচ তাকে খাওয়াব কি, তার ঠিকানা নাই; তার পরে সে কাগজ ওয়ালারা চিঠি দিয়েছে যে এইমাস থেকে মাইনে বন্ধ করে দেবে। সেই ভাবনায় ও আরও অস্থির হয়ে পড়েছে।"

"তারা কি এমন অবিচার করবে, দিদি? আমি একবার সে চিঠিখানা দেখ্‌তে পারি?"

"সে ভাই ইংরেজিতে লেখা"—বলিয়াই মা থামিয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল ইংরেজি চিঠি সুপ্রভা পড়িলেও পড়িতে পারে। তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যামিনীর শয্যার উপর হইতে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। যামিনী তখন নিদ্রিত ছিল।

সুপ্রভা দু'তিনবার চিঠিখানি পড়িল এবং সযত্নে পুনরায় খামে রাখিয়া দিল। 'প্রতিধ্বনি' পত্রের সম্পাদক লিখিতেছেন "বহুদিন আপনার অনুপস্থিতি হেতু অফিসের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, এজন্য অস্থায়িভাবে আপনার স্থানে লোক নিযুক্ত করা হইল। সুতরাং বর্ত্তমান মাস হইতে আপনার বেতন নূতন ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে।" সম্পাদক পরিশেষে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি সপ্তাহে অন্ততঃ কিছু প্রবন্ধও তিনি

জোগাড় করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলেও সত্ত্বাধিকারীকে বলিয়া কহিয়া তিনি তাঁহার অর্দ্ধ বেতন মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন।

সুপ্রভা ভাবিতে লাগিল। সেদিন সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লেখা পড়ায় কাটাইল। তাহার মা ভাবিলেন, "যাক্, ঐ করিয়া যদি অভাগীর মনে শান্তি হয়, তবে থাক্ ও লেখাপড়া লইয়া; অদৃষ্টে কি যে আছে!" তিনি মাঝে মাঝে যামিনীর খবর লইতে লাগিলেন এবং সুপ্রভা ঘরে গেলে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতে গেলেন, সুপ্রভা বাহিরের ঘরের আলমারী হইতে তাহার একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়া, তাহা হইতে একটি প্রবন্ধ সংকলন করিতেই রাত্রি করিয়া ফেলিয়াছিল। পরদিন সে প্রভাতে একখানি খামে পূরিয়া প্রবন্ধটি সম্পাদকের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। চাকরকে বলিয়া দিল, "জিজ্ঞাসা করলে বাবুর নাম বলবি; জবাব নিয়ে আসিস্।"

যথা কালে চাকর জবাব লইয়া ফিরিল। কম্পিত হস্তে সুপ্রভা চিঠি খুলিয়া দেখিল, সম্পাদকের সুর বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার অসুখ সারিতেছে না বলিয়া আমরা সকলেই দুঃখিত। আপনি যাহাতে পূরা বেতনে আরও এক মাসের ছুটি পান, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি অদ্যই সত্ত্বাধিকারীর সহিত দেখা করিতে চলিলাম। আপনার প্রেরিত প্রবন্ধটি পাইলাম। অতি সুন্দর হইয়াছে। এই সপ্তাহেই যাইবে, আরও এমন দু'একটি দিতে পারিলে যথার্থ

উপকার হয়। ভাল প্রবন্ধের সংখ্যা বড়ই অল্প, আগামী সপ্তাহে এইরূপ আর একটি প্রবন্ধ চাই-ই চাই।"

পরদিন প্রত্যূষে আফিসের খামে টাইপ করা চিঠি আসিল। যামিনী বৌদিদিকে ডাকিয়া শুনাইল, স্বত্বাধিকারী পূরা বেতনে তাহার ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহার মুখে চোখে গর্ব্ব-পুলকিত দীপ্তি দেখিয়া বৌদিদি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি বৌকে ডাকিতে ছুটিলেন। বৌ সংবাদ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল না—আনন্দে অধীর হইল না; কৃতজ্ঞতায় কাঁদিয়া ফেলিল এবং যোড়করে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

তাহার স্বামী ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

৬

সুপ্রভার শুশ্রূষার মধ্যে এমন একটা ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, যাহা তাহার স্বামীর অজ্ঞাতসারে সঞ্জীবনীর কার্য্য করিতেছিল। তাহার স্নেহের অধীরতা ছিল না, অনাবশ্যক যত্নের আধিক্য ছিল না, উচ্ছ্বসিত করুণার আবিলতা ছিল না। রোগীর পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তাহার সুস্পষ্ট ধারণামূলক নিপুণতা ছিল, আর সেই সঙ্গে চোখের কোণে প্রচ্ছন্ন স্নেহের যে অকারণ মসৃণতা ফুটিয়া উঠিত, তাহাতে রোগীর মনে অপূর্ব্ব শান্তি আনিয়া দিত।

চারুবালা ভ্রাতার অসুখের সংবাদ পাইয়া দুই তিনবার দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিবি বউয়ের আচরণে তিনিও বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। বিবাহের পূর্ব্বেও তিনি সুপ্রভাকে

দুই একবার দেখিয়াছিলেন, বিবাহের পরেও দেখিয়াছেন; কিন্তু এমন দৈন্য তাহার কখনও দেখেন নাই! এই শীর্ণ চেহারা, এমন মলিন বসন, এমন গৃহ কর্ম্মনিপুণতা, এমন শুশ্রূষা-পরতা তিনি সুপ্রভার পক্ষে কখনও সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই, কিন্তু, তাহা হইলে কি হয়? তাঁহার মনে বিবি বউয়ের প্রতি অনুকূল ভাব একটুও ছিল না, হিন্দুর ঘরে এমন বউ কখন কি লক্ষ্মীশ্রী আনিতে পারে? এ বউ আসা অবধি সংসারে আগুণ লাগাইয়াছে, তাহার পিতার মৃত্যু, ভ্রাতার অসুখ—এ সবই যে ঐ ' অপয়া ' বউয়ের জন্য, সে কি আর বলিতে হইবে? হতভাগিনী বৌদিদি কেন যে বোঝে না, চারুবালা সেইটি-ই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, বৌদিদির অন্য কথা নাই—শুধু টাকা দাও, টাকা দাও, নহিলে ভাইয়ের প্রাণ বাঁচে না। কেন, সংসার ত দিব্য চলিয়া যাইতেছে।

সংসার দিব্য চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সুপ্রভা আপনাকে বলি দিতে বসিয়াছে। এই দুই মাস তাহার চোখে ঘুম নাই বলিলেও চলে। সে স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়া প্রবন্ধ লিখিতে বসে; আর কোনও কোনও দিন প্রভাত বিহগের সঙ্গীতে আসন পরিত্যাগ করে। তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের কাছে লোক পাঠাইয়া সে অনেক আধুনিক পুস্তক ও পত্রিকা আনাইয়া লইয়াছে।

যামিনীকান্ত এ সকল কিছুই জানিত না। সে তাহার পূরা মাহিয়ানা পাইতেছে ও পাইবে, এই আশায় তাহার রোগ-শীর্ণ দেহে বল সঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু একদিন তাহার মনে একটা

প্রকাণ্ড সংশয়ের ধাক্কা লাগিল—তখন সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সম্পাদক তাহাকে একখানি দুইশত টাকার চেক পাঠাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন "এ টাকা অতিরিক্ত প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হইল; জনসাধারণ প্রবন্ধগুলি বিশেষ আদরের সহিত পাঠ করিতেছে। কাগজের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। 'স্ত্রীশিক্ষা ও গৃহকর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটি যে সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার মুদ্রণের আবশ্যক হইয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের স্ত্রী-শিক্ষা-পদ্ধতির এরূপ সম্পূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় হয় নাই।"

সুপ্রভা দেখিল—চেক ও চিঠি, এবং স্বামীর বদনমণ্ডলে সংশয়ের অন্ধকার। তাহার মন দমিয়া গেল। এখন সে যে কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না। স্বামীর নিকট সমস্ত বলিয়া ক্ষমা চাহিবে? একবার লেখা-পড়ার জন্য সে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, আবারও যদি হয়? এ চিন্তায় তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সেই দিনই রাত্রে একটি কাণ্ড ঘটিল, যাহাতে সে ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল।

তখন রাত্রি ৩টা বাজিয়াছে, প্রতিদিনের মত সুপ্রভা স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়া লিখিতে বসিয়াছিল; কিন্তু আজ তাহার হৃদয়ে আশঙ্কার যে তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহাতে তাহার সমস্ত চিন্তার সূত্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। একখানি রুষীয় উপন্যাসের দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী সংস্করণ হইতে সে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিতেছিল। "প্রতিধ্বনি"তে চারি পাঁচ সংখ্যায় তাহার কতক

অংশ বাহির হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় আর কতক অনুবাদ না করিয়া দিলেই নয়। কিন্তু কিছুতেই সে মনঃ সংযোগ করিতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর তাহার শ্রান্ত অবসন্ন দেহ ঘুমের ভারে অবনত হইয়া পড়িল। টেবিলের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যামিনীকান্ত ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে, সুপ্রভা শয্যায় নাই! সে পা টিপিয়া টিপিয়া পড়িবার ঘরে আসিল এবং একটু দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিল। সে নিজেও সেই উপন্যাসের ক্রমশঃ প্রকাশ্য অনুবাদ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছে। কিন্তু তাহা যে সুপ্রভার লেখা, এ সংশয় তাহার কখনও মনে আসে নাই। "প্রতিধ্বনি"তে লেখকের নাম দিবার প্রথা ছিল না। তখন সে চেকের রহস্য, তাহার পূরা বেতনের রহস্য সমস্তই বুঝিতে পারিল। কিছুই না বলিয়া, উপন্যাসখানি ও যে অংশটুকু সে দিন অনুবাদ করা হইয়াছিল, তাহা লইয়া সে শয়ন গৃহে ফিরিল।

একটু পরেই সুপ্রভা জাগিয়া দেখিল, তাহার বই ও প্রবন্ধ অপহৃত হইয়াছে। বুঝিল, সে ধরা পড়িয়াছে! ভয়ে ও লজ্জায় তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সে প্রদীপটি নিবাইয়া ধীর পদে শয়ন কক্ষে আসিল।

যামিনীকান্ত কোনও সাড়া না দিলেও সে বুঝিল যে তিনি জাগিয়া আছেন। সে কিছুই না বলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার প্রান্তে বসিয়া স্বামীর দুইখানি পদ আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইল। তাহার এই মৌন মার্জ্জনা-ভিক্ষা যামিনীর মর্ম্মস্পর্শ করিল এবং

সে উঠিয়া অতি যত্নে স্ত্রীর মস্তক নিজের বক্ষে টানিয়া লইল।

তার পরদিন সুপ্রভার জন্য অনেক টাকার বাঙ্গলা ও ইংরেজী বই গাড়ী বোঝাই করিয়া হাসিতে হাসিতে যখন যামিনীকান্ত বাড়ীতে ফিরিল, তখন সুপ্রভার মনে আর আশঙ্কার লেশমাত্র রহিল না।

কলঙ্কিনী

পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী যশপুরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পল্লীগ্রামে সম্মান সর্ব্বত্র অর্থের অনুগামী; কিন্তু পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর সম্মান শুধু অর্থের উপর নির্ভর করিত না; তিনি বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের সমস্ত মামলা মোকদ্দমা সুচতুর পীতাম্বরের পরামর্শে চলিত; যে পক্ষ পীতাম্বরকে ধরিতে পারিত তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। তার উপর পীতাম্বরের তেজারতী কারবার ছিল। তেজারতী অর্থাৎ টাকা কর্জ্জ দিবার একটি সুবিধা এই যে, লোকে সুদের হার চড়া বলিয়া যতই ওজর আপত্তি করুক না, যতই সেজন্য লোকে মহাজনকে ঘৃণা করুক না, কেহই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। কারণ কবে কাহাকে টাকার দায়ে পড়িতে হইবে, আর শেষে ঐ পীতাম্বর ঠাকুরের কাছেই হয়ত হাত যোড় করিতে হইবে; সেই জন্য গ্রামের সকলেই পীতাম্বরের বশ্যতা স্বীকার করিত। গ্রামে যে সব দলাদলি হইত, পীতাম্বর তাহার জনক ছিলেন, আবার যখন সে সকল মিটিয়া যাইত, তখন পীতাম্বরের দ্বারাই মিটিত। পীতাম্বর নিজে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইলেও তিনটি কন্যাকে কুলীনের হস্তে সম্প্রদান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। গ্রামস্থ

ব্রাহ্মণগণও এজন্য পীতাম্বরকে কতকটা মান্য না করিয়া পারিতেন না।

এইরূপে নানা প্রকারে প্রতিষ্ঠা ও মান অর্জ্জন করিয়া পীতাম্বর যশপুরের সামাজিক জীবন প্রবাহকে আপনার ইচ্ছামত পরিচালিত করিতেছিলেন, তারপর একদিন যখন তিনি শেষ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তখন যে যশপুরের পল্লীজীবন ভগ্ন-বাঁধ স্রোতস্বিনীর মত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর বিচিত্র কি? যাহারা এতদিন পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর জন্য পসার করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অপূর্ব্ব সুযোগ পাইলেন। দলাদলিতে যাহারা এতদিন পীতাম্বরের জন্য খাটো হইয়াছিলেন, তাঁহারা শির উর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং পীতাম্বরের শ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া তাহার শিশুপুত্র-টিকে বিপন্ন করিবার পথ আবিষ্কার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এতদিন পীতাম্বর যাহাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াছেন, সলা পরামর্শ দিয়াছেন, তাহারা তাঁহারই খাতক দিগকে পরামর্শ দিল যে, "পীতাম্বরের পাওনা টাকা শোধ দিবার কিছু প্রয়োজন নাই, শিশুপুত্র বড় হইয়া যখন নালিশ করিবে তখন আমরা সকলে সাক্ষী দিব যে খত জাল; কিছু ভয় নাই, আপাততঃ কিছু বাজার খরচ ও গাছের আম কাঁঠাল আমাদিগকে দিলেই চলিবে।"

পীতাম্বরের পারিবারিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল পত্নী জগদম্বা সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার

দেখিলেন। জমাজমি যাহা কিছু আছে, তাহা দেখিবার লোক নাই। তেজারতীর টাকা আদায় করিবার লোক নাই। গোমস্তা একজন আছে বটে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে হিসাব বুঝিয়া লইবার মত কেহই নাই। তিনটি কন্যা সৎপাত্রে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু শিশুপুত্রের অভিভাবক যে নাই। দুইটি কন্যা শ্যামা ও কামিনী শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছে; কনিষ্ঠা যামিনী বিবাহের সময় মাত্র শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, তার পরে সে মায়ের কাছেই রহিয়াছে। বেচারা যখন তাহার কল্পনার তুলিকায় স্নেহপ্রীতি-করুণার রঙ ফলাইয়া শ্বশুরবাড়ীর সম্মোহন চিত্র আঁকিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। কাজেই তাহার আশার গগনে চারিদিক হইতে মেঘ উঠিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে তাহার কপোল বহিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রু বহিত।

গ্রামের লোকের অত্যাচার, উপকৃতের অকৃতজ্ঞতা, কুটুম্ব-দিগের অতিমাত্র ঘনিষ্ঠতা, জগদম্বাকে ভীত ত্রস্ত ও বিড়ম্বিত করিয়া তুলিল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার বড় জামাইকে সংবাদ দিলেন। শ্যামার স্বামী শিবশঙ্কর সপরিবারে যশপুরে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। নামে মাত্র শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করিয়া শিবশঙ্কর পীতাম্বরের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে মন নিবিষ্ট করিলেন। ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও যখন শ্যামা বা শিবশঙ্কর নিজ বাড়ীতে যাওয়ার নামও করিলেন না, তখন জগদম্বা একটু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কুলীন জামাইকে

কিছু ত বলা চলে না। শিবশঙ্কর কথায় কথায় শাশুড়ীকে শুনাইয়া দিতেন যে, কেবল তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি স্বীয় বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া যশপুরের মত কদর্য্য স্থানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। জগদম্বা মনে মনে খতাইয়া দেখিলেন যে, মঙ্গল তাঁহার একার নহে। ছেলেটি পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়াছে, গুরুমহাশয়ের বেতন শোধ হয় না। খতের টাকা আদায় হয়, তাঁহার হাতে পৌঁছে না। জমির ধানে বছর খরচ চলিত, এ বছর জমিদারের লোক ধান বেচিয়া খাজনা শোধ করিয়া লইয়া অবশিষ্ট যাহা ছাড়িয়া দিল, তাহাতে তিন মাস খাবার সংস্থান হওয়া দুর্ঘট। এইরূপ ভাবে দিন কাটিতে লাগিল; শিবশঙ্করের পরোপকার-ব্রতে জগদম্বার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। শ্যামা বলিত, "মা, তোমার আর কি? দিনান্তে দুটি শাকভাত হইলেই তোমার ক'টা দিন চলে যাবে। সন্তুর জন্য যা' কর্‌তে হয়, উনিই কর্‌বেন, সে জন্য তুমি কিছু ভেব না।" বাস্তবিক সেদিকে ভাবনার কিছু ছিল না।

জগদম্বার ভাবনা সে জন্য বড় নয়; তাঁহার ভাবনা যামিনীর জন্য। কারণ তিনি জানিতেন যে, সন্তোষের যাহাতে ভাল হয়, তাহা শিবশঙ্কর করুন আর না করুন, তাঁহার নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই। গ্রামে শত্রু প্রবল, তাহাতে তিনি মেয়েমানুষ হইয়া কতকাল তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন? জামাই কৃপা

করিয়া যাহা করেন, সে-ই লাভ। সন্তোষের তত লাভ না হয়, শিবশঙ্করের ত হ'বে। শিবশঙ্কর না থাকিলে যে বারো ভূতে লুটিয়া খাইবে!

জগদম্বা যামিনীর জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। যামিনী পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাকে আর অধিকদিন পিতৃগৃহে রাখা ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ যামিনী যে আজকাল বেশী বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে, ইহা মাতার চক্ষু এড়ায় নাই। তাই তিনি যামিনীকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জামাই কুলীন; বিবাহের পর কন্যা প্রথম পতিগৃহে যাইবে, তাহার উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা জগদম্বার সাধ্যাতীত। শিবশঙ্করকে বলিলে, তিনি চক্ষু বুজিয়া থাকেন (শিবশঙ্কর অহিফেন-সেবী)। শ্যামাকে বলিলে সে সমবেদনা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। "আহা, ওর শ্বশুর কি লোক গা? মেয়ে সোমত্ত হ'ল, অথচ নেবার নামটি নেই? লোকের কি জাত মানেরও ভয় নেই?"

জগদম্বা বলেন, "তাদের কি, বাছা? কুলীন মানুষ একটার জায়গায় পাঁচটা বিয়ে কর্‌লেও কিছু বল্‌বার যো নেই।"

শ্যামা গর্জিয়া উঠিল, "কেন, তারা একাই কি কুলীন? আর কেউ কুলীন নেই বুঝি? এই ত এঁরা সবে পাঁচ পুরুষে ভঙ্গ, এঁদের মুখের কথায় লোকে পায়ের কাছে মেয়ে নিয়ে লুটোয়, তবু ত কই একটা ছেড়ে আর একটা বিয়ে করুক দেখি!"

জগদম্বা দেখিলেন এ তর্কে অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাই তিনি মেয়ের হাত ধরিয়া চোখের জল অঞ্চলে মুছিয়া বলিলেন—

“মা, সবাই কি সমান হয়? আমার শিবুর মত শতকে গোটা মেলা ভার! মা অন্নপূর্ণা বাঁচিয়ে রাখুন। তুই মা তাকে বলে ক’য়ে যামিনীকে শ্বশুরবাড়ী যাবার মত গুছিয়ে দিতে বল্, আমি তাঁদের পত্র লিখি।”

শ্যামা সে ভার অগত্যা গ্রহণ করিল। জগদম্বা যামিনীর শ্বশুর অন্নদা মুখুয্যেকে চিঠি লিখিলেন—জামাই আসিয়া মেয়ে লইয়া যাউন; অগ্রহায়ণ মাস প্রায় শেষ হয় এই মাসের মধ্যে যে দিন ভাল থাকে, সেই দিনই তিনি মেয়েকে তুলিয়া দিতে রাজি আছেন।

অন্নদা মুখুয্যে পীতাম্বরের বেয়াই; পীতাম্বরের মতই চতুর। তিনি বুঝিলেন যে, ছেলেকে পাঠাইলে সে শ্বাশুড়ীর মায়া কান্নায় ও যুবতী বধূর কটাক্ষে ভুলিয়া যাইবে, পাওনা গণ্ডা আদায় হওয়া কঠিন হইবে। বেয়াই জীবিত নাই, এ অবস্থায় তিনি নিজে গেলে বেয়ান যদি ধরিয়া পড়ে, তবে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করা কঠিন হইবে। সুতরাং যথাকালে তিনি উত্তর দিলেন যে, ‘বধূকে এতদিন পাঠান উচিত ছিল; এখন যে দিন খুসী পাঠাইলেই ত হয়। এর জন্য আবার ইস্তাহার জারির প্রয়োজন কি?’

জগদম্বা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি ত আর কৃপার ভিখারী

নন। তিনি বুঝিলেন যে, পাছে পাওনার বিষয় লোকসান হয়, এই জন্যই বেয়াই এই চাল চালিয়াছেন। জগদম্বা সেই দিনই হারুর মা ও হারুকে বলিয়া রাখিলেন যে, যামিনীকে ঘোষপুরে রাখিয়া আসিতে হইবে। দিন দেখা হইল, শিবশঙ্কর হাটবাজার করিয়া জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন; তাহাতে তাঁহারও নিতান্ত লোকসান হইল না। খরচ-সাপেক্ষ যে কোনও কাজে শিবশঙ্করকে একবার লাগাইয়া দিতে পারিলেই হয়।

নৌকা আসিল। হারু ও তাহার মাকে ডাকিয়া পাঠান হইল; শিবশঙ্কর এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোনও খোঁজ করেন নাই। তাহারা যখন যাত্রার সজ্জা করিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে চক্রবর্ত্তীগৃহে আসিয়া হাজির হইল, তখন তিনি চটিয়া লাল। শ্যামাকে তখনই তলব হইল; "শ্যামা, ব্যাপার কি? আমি কি কেউ নই নাকি? হারুর মা যাবে, আর ঐ হতভাগা পাজি বিট্‌কেল হারুটা যাবে, অথচ আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করা হ'ল না! এসব কি কাণ্ড? তোমার মাকে গিয়ে বল এ সব হবে টবে না। হারুর মত চোঁয়াড় বদমায়েসের সঙ্গে যামিনীকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না।"

শ্যামা ভয়ে ভয়ে একবার বলিল, "তা যাক্‌ না কেন ওরা, তোমারই বা কি মাথা ব্যথা? মা যা হয় করুন গে। আর হারুর মাও যখন যাচ্ছে—"

শিবশঙ্কর বলিলেন, "সে আমি কিছুতেই হতে দেব না, ওরা লোক অতি পাজি। কুটুম বাড়ী অমন লোক পাঠাতে নেই, তারা

হারুর সঙ্গে অমন একটি ডব্‌কা মেয়েকে দেখলে কি বল্‌বে বল দেখি? আমি হরিকে বলে দিচ্ছি, ও-ই গিয়ে রেখে আসবে এখন।"

আসল কথা শিবশঙ্কর প্রকাশ করিলেন না। হারু ও তাহার মা চক্রবর্ত্তী পরিবারের একান্ত অনুগত। এদের অন্নে ওদের শরীর। পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভিটায় যখন শ্যামা ও শিবশঙ্কর-রূপ জোড়া ঘুঘু চরিতে আরম্ভ করিল, তখন ওরাই কেবল জগদম্বার অশ্রুতে নীরবে অশ্রু মিশাইয়াছে। জগদম্বার আদেশ তাহারা প্রাণপাত করিয়াও পালন করিত। সন্তুর জন্য খেজুর বকুল আম জামরুল সংগ্রহ করিতে তাহাদের আলস্য ছিল না। যামিনীর জন্য দূরের হাট হইতে শাঁখা চিরুণী কিনিয়া আনিত ওরা-ই; শিবশঙ্কর বা শ্যামার কথা উহারা একেবারেই শুনিতে চাহিত না; উহারা যে তাঁহাদের ভাল চোখে দেখে না, সে কথা শিবশঙ্কর জানিতেন কিন্তু তাহা ত প্রকাশ্যে বলা যায় না।

জগদম্বা বুঝিলেন। কিন্তু জামাইয়ের উপর কথা কহিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। বিধবা—বিশেষতঃ হিন্দু বিধবা যে বাঁচিয়াও মরিয়া থাকে। তাহার সকল সাধ আশা, প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সবই স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। একবিন্দু অশ্রু অজ্ঞাতে সঞ্চিত হইয়া জগদম্বার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করিয়া দিল মাত্র।

হারু ও হারুর মার যাওয়া হইবে না, তাহা তিনি বুঝিলেন। হরির সঙ্গে পাঠাইতেই বা আপত্তি কি? হরি জগদম্বার আত্মীয়;

কিন্তু সেরূপে হরি এ অসময়ে দেখা দেন নাই। হরি শিবশঙ্করের মামাতো ভাই। উভয়ের প্রায় একই বয়স, উভয়েই প্রৌঢ় ; উভয়েই সংসারের জুয়াখেলায় প্রবীণ, পরিপক্ক খেলোয়াড়। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর বে-ওয়ারিশ সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ-কল্পে শিবশঙ্কর যখন যশপুরে আসিলেন, তখন তাঁহারই দোসর বা মোসাহেব হিসাবে হরিও আসিয়া জুটিলেন। জগদম্বা মাসীর সহিত পূর্ণ প্রীতি রাখিয়া চলাই হরির প্রথম লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য হরি প্রকাশ্যতঃ নির্লিপ্ত ভাবেই চলিত। দু'বেলা দুটি খাওয়া, শিবশঙ্করের আজ্ঞা পালন করা এবং বিকালে প্রতিবেশীর পুকুরে মাছধরা অথবা তাহাদের বৈঠকখানায় পাশা ও তামাকের আড্ডায় যোগ দেওয়া হরির প্রধান কাজ ছিল। পরিশ্রমের যত কিছু কায, সে সবই শিবশঙ্কর হরির দ্বারা করাইত। ক্ষেতের ধান বাড়ীতে আনা, বাগানের ফল পাড়ানো প্রভৃতি কায হরি আপনার জনের মতই করিত। শিবশঙ্কর জগদম্বাকে বুঝাইতেন একজন লোক রাখিতে হইলে মাহিয়ানা দিতে হইত, হরি শুধু পেটে দুটি খায় বই ত নয়। হরি তাহাকে বলিত, "মাসি, দুদিন পরেই ত তোমার জামাই পাততাড়ি গুটাবে, তখন দেখে নিও, হরিচরণ শর্ম্মা একাই তোমার সংসার খাড়া করে' ঠেকিয়ে দেয়।" হরির কথায় জগদম্বার প্রাণে আশ্বাসের সঞ্চার হইত।

হরি জগদম্বার মন যেরূপ সহজে ভিজাইতে পারিয়াছিল, তাহার শিশু পুত্রটি বা যামিনীর মন সেরূপ পারে নাই। সন্তোষ

কোন মতেই হরিদাদার সঙ্গ পছন্দ করিত না। যামিনীর প্রতি হরি প্রথম প্রথম বড়ই পক্ষপাত দেখাইয়াছিল, কিন্তু যামিনী বিদ্রুপবাণে তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিত। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে যামিনী সংসারকে একটু আধটু চিনিতে শিখিয়াছে। যামিনী যে দিন রান্নাঘরে রাঁধিতে যাইত, হরি সে ঘরের বারান্দায় গিয়া রামপ্রসাদী ভাঁজিতে বসিত। যামিনী তাহাকে বলিত, "হরি দাদার গানে গাছের পাতা ঝরে' পড়ে, বেগুন আলুনী হয়, আর ধোপা বউয়ের বোঝা বাড়ে।" হরির মস্তকের টাক লইয়াও সে নানাপ্রকার রহস্য করিতে ছাড়িত না। ইহার ভিতর যে একটু অবজ্ঞার ভাব ছিল, তাহাতে হরিচরণের ঘনিষ্ঠতা-প্রবৃত্তির পথে কণ্টক দিয়া দিত। হরি বুঝিত, ওদিক না মাড়ানোই ভাল।

সে দিন হারুর মা যখন জগদম্বার দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার কাঁরে কাচা কাপড়ের পুটুলিটি লইয়া ঘরের দাওয়া হইতে নিঃশব্দে উঠিয়া গেল, তখন যামিনীর মনটা খাঁচার পাখীর মত ছটফট করিয়া উঠিল। কিন্তু সে করিবে কি? তাহার ত কোনই হাত নাই! নিজে যে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবে, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে সাহসও তাহার চলিয়া গেল। পাছে হরি দাদার সঙ্গে যাইতে আপত্তি করিলে, তাহার পতিগৃহে যাইবার পক্ষে বাধা পড়িয়া যায়, সেই আশঙ্কা-ক্রমে সে কিছুই বলিতে পারিল না। অপরাহ্ণে সে কাঁদিয়া কাটিয়া বিদায় লইয়া নৌকায় উঠিল।

৩

যামিনীকে লইয়া একাকী নৌকারোহণে কোথায়ও যাইতে হইবে, ইহা হরিচরণ কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এমন একটি অসম্ভব ব্যাপার যে কখন কি ভাবে অকস্মাৎ সম্ভব হইয়া পড়িল, তাহা বুঝিতে হরিচরণের কিছু সময় কাটিয়া গেল। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ সূর্য্য কিরণের মধ্য দিয়া নৌকাখানি পালের সাহায্যে তর তর করিয়া যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখনও হরিচরণের চমক ভাঙ্গে নাই। সে ছাপ পরের বাহিরে পালের বাঁশে ঠেস দিয়া নিবিষ্ট ভাবে সেই কথাই ভাবিতেছিল,— যামিনীর সঙ্গে সে আজ একা।

যামিনী ষোড়শী, তাহার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে; তাহার আয়ত নয়নের আর্দ্র পক্ষ্মপংক্তি আরক্ত গণ্ডস্থলের উপর ভ্রমর পাঁতির মত নিবিড় ভাবে রহিয়াছে! সেও যেন চিন্তাভারনত। যতক্ষণ তাহার গ্রামের ঘাট, পল্লীবাট, সূর্য্যকর-চুম্বিত বৃক্ষাগ্র-ভাগ দেখা যায়, ততক্ষণ সে এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিল। তাহার পীন বক্ষস্থল নিরুদ্ধ ক্রন্দন বেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। হরিচরণ তাহার চোখের কোণ দিয়া মাঝে মাঝে একবার যামিনীকে দেখিয়া লইতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন তীরস্থিত বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে ক্রমশঃ জমাট বাঁধিতেছিল, তেমনই একটা অন্ধকারময় অভিসন্ধি হরিচরণের বক্ষপঞ্জরের মধ্যে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

হরিচরণ চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিল। যামিনীর রূপের নেশা হরিচরণকে যে আজ হঠাৎ উন্মত্ত করিয়া তুলিল, তাহা নহে। যামিনীর ক্রমবিকশিত যৌবনের উছলিত লীলা-তরঙ্গ তাহাকে অনেক দিন হইতে মোহিত করিয়াছিল। কিন্তু যামিনী কখনও ভুলিয়াও হরিচরণের ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই, বরং সময়ে সময়ে নির্ম্মম ভাবে তাহার সে প্রবৃত্তিকে উন্মেষেই লাঞ্ছিত করিয়া দিয়াছে। আজ তাহাকে এমন ভাবে অসহায় অবস্থায় পাইয়া, হরিচরণের মন ঝড়ের নৌকার মত অস্থির ও দিগ্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া উঠিল। তাহার মন তাহাকে বুঝাইল যে এই সুযোগ। কিন্তু আশঙ্কা—পাছে ব্যর্থ হয়। কারণ হরিচরণ জানিত যে, যামিনী তাহার প্রতি পক্ষপাতী নহে। তাহাকে কৌশল করিতে হইবে। সে যদি এমন কোনও মন্ত্র জানিত, যাহার দ্বারা মানুষের মন চট করিয়া বশ করা যায়, তাহা হইলে তাহার অভীষ্ট সাধনপক্ষে সুবিধা হইত! বল-প্রয়োগ অসম্ভব, কেন না মাঝিরা জানিবে। মাঝিদের যদি কোনও উপলক্ষে কোথায়ও কিছু সময়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে?—কিন্তু কি বলিয়া সে প্রস্তাব করা যায়? অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বশ করা যাইতেও পারে কিন্তু সে পরিমাণ প্রচুর অর্থ কোথায়? হরিচরণ ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছিল না—আর শয্যাকণ্টকগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ক্রমাগত ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

রাত্রি যতই গভীর হইতে লাগিল, হরিচরণের লালসা ততই

তীব্র হইয়া উঠিল। অন্ধকার রাত্রি; ছোট নদীর মধ্য দিয়া নৌকা অলস গতিতে চলিয়া'ছ। মাঝিরা দাঁড় ফেলার তালে তালে গুণ গুণ করিয়া গান গায়িতেছিল। ঝিঁঝির অবিরাম রব সে গুঞ্জনগীতির স্বরে স্বর মিলাইতেছিল। আকাশের তারা-গুলি অন্ধকারের মধ্যে যেন ভয়ে ভয়ে চাহিয়া ছিল। নদীর ধারে ছোট বড় গাছের মধ্যে জোনাকীর মেলা বসিয়া গিয়াছিল। দাঁড়ের শব্দে, ঝিঁঝির রবে, মাঝির গানে, নদীর তরলতা ও তারার ক্ষীণ দীপ্তি মিশিয়া এমন একটা নিস্তব্ধ বিজন শান্তি আনিয়া দিতেছিল যে চোখের পাতা আপনি মুদিয়া আসে। কিন্তু হরিচরণের চোখে ঘুম নাই। তাহার বুকে আজ যে দেবতা বাসা বাঁধিয়াছেন, তাঁহার বিলাস-লীলায় আজ তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুত্তরঙ্গ ছুটিতেছে। সে কেবলই এপাশ ওপাশ করি-তেছিল; কখনও উঠিয়া বসিয়া নদীর জলের দিকে, তীরের তরুপুঞ্জের দিকে নিষ্ফল ব্যাকুলতায় তাকাইয়া ছিল। সমস্ত মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া সে একটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না—কেমন করিয়া সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। মাঝিরা জানিতে না পারে, অথচ কার্য্য সিদ্ধি হয় এমন কোনও কৌশলই সে উদ্ভাবন করিয়া উঠিতে পারি-তেছিল না। কিন্তু উপায় যতই আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল, ততই তাহার কামনার উত্তেজনা বাড়িয়া গেল।

যামিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিল। নৌকার ভিতরে অল্প পরিসর স্থান ; সে যেখানে শুইয়া ছিল তাহারই অতি নিকটে হরিচরণের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঘুমের ঘোরে কতবার যে যামিনীর পদযুগল হরিচরণের অঙ্গে লাগিয়া তড়িত সঞ্চার করিয়াছে তাহার অন্ত নাই। রূপসী তরুণীর এই ঘুমন্ত স্পর্শে হরিচরণের যেটুকু চৈতন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল।

মাঝিরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর নৌকার সম্মুখ পাটাতনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নৌকা তীরে বাঁধা রহিয়াছে পারের গ্রামগুলি অদূরে নিস্তব্ধতায় মগ্ন। গভীর নিশীথের গম্ভীর ঝিল্লীরব, নৌকার ত্ব'ধারে নদীর জলের কল কল ছল ছল শব্দ আর মাঝিদের কর্ম্মক্লান্ত সুপ্ত দেহ মন্থন করিয়া যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, তাহার শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ সে প্রদেশে ছিল না। স্রোতের ঈষৎ ত্বলুনীতে নৌকা থাকিয়া থাকিয়া ত্বলিয়া উঠিতেছিল। হরিচরণ যামিনীর বড় কাছে ঘেঁসিয়া শয়ন করিল। সেই অন্ধকারেও তাহার সর্ব্বাবয়বের সরল সুস্থ পরিপূর্ণতা হরিচরণকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। সে অতি সন্তর্পণে যামিনীর একখানি হস্ত নিজের উভয় হস্তে লইয়া চাপিল। এক দিকে আশঙ্কা, অন্য দিকে তীব্র লালসা, তাহাকে যেন কেমন এক রকম করিয়া ফেলিল!

যামিনী সেই মৃত্ব স্পর্শেও চমকিয়া উঠিল এবং হরিচরণকে আপনার অতি নিকটে শয়ান দেখিয়া, 'হরিদা, হরিদা' বলিয়া ডাকিল। হরিচরণ প্রথমটা সাড়া দিল না। তখন যামিনী

েকবারে উঠিয়া খাড়া হইয়া বসিল এবং পুনঃ পুনঃ ধাক্কা য়া তাহাকে আস্থির করিয়া তুলিল।

হরিচরণ উঠিল না, কিন্তু পুনরায় যামিনীর হস্ত গ্রহণ রিবার চেষ্টা করিল। এবারে যামিনী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে ারিল। সে প্রথমটা মনে করিয়াছিল যে, হরিদা বোধ হয় মের ঘোরে গড়াইতে গড়াইতে তাহার বিছানায় আসিয়াছে। মিনীর নিজেরও ঘুমের ঘোর তখন ভাল করিয়া কাটে নাই। মের অবস্থায় সহসা কোনও বিপদ ঘটিলে, অনেক সময় মতি-ভ্রম ঘটে। ঘুমের প্রভাব যতই কমিয়া যাইতে লাগিল, ততই া হরিচরণের মনোভাব বুঝিতে পারিল। সে প্রবল বেগে ত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "একি হরি দা, তোমার এই বহার?"

হরিচরণ তাহাকে চাপা সুরে ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর লছি। নইলে ভাল হবে না।"

যামিনী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল, "কেন, চুপ করবো? ই জন্যে তোমরা হারুর মাকে আসতে দিলে না! এখন আমি তামাদের মতলব বুঝতে পেরেছি। এক্ষুণি যদি তুমি উঠে ায়ে না শোও তোমার যায়গায়, তাহলে আমি চেঁচিয়ে াঝিদের জাগিয়ে দেবো।"

"তা দে'না; আমার ত ভারি বয়ে যাবে। কলঙ্ক হ'তে তারই হবে।"

যামিনী ভয় পাইল। সে কাঁদো কাঁদো সুরে বলিল,

"হরি দা, আমি তোমার বোন্। তোমার পায়ে পড়ি, উঠে যাও।"

হরিচরণ মনে করিল যামিনী নরম হইয়াছে। তখন সে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল—

"দেখ্, যামিনী, অনেক দিন থেকে আমি এই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করছি। তোদের বাড়ীতে যে আমি এত দিন পড়ে আছি, আর মুটে মজুরের মত খট্‌ছি সে কেবল তোরই জন্যে। এখন তুই যদি আমাকে এমন করে অপমান করিস ত তোর ভাল হবে না। আমি তা হ'লে তোর শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘুচিয়ে দেবো। দেখ্, আমি যদি এখন এই নৌকা থেকে নেমে যাই, তা হলে সাত জন্মেও তোর শ্বশুরবাড়ী স্থান হবে না। লোকে বল্‌বে মোছলমান মাঝির সঙ্গে ওর জাত গেছে।"

হরিচরণ অনর্গল বলিয়া গেল। যামিনী ভাবিতে লাগিল, কোন্ অশুভ লগ্নে সে আজ পা বাড়াইয়াছে! আজ তাহার পিতার কথা মনে হইল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সাধ্য কি, কেহ এমন অপমান করে! তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। কিন্তু সে স্থির অবিকম্পিত [illegible]বে বলিল—

"ভাগ্যে আমার য[illegible], হবে। কিন্তু তুমি আবার যদি ও কথা আমায় বলো, [illegible] এখুনি জলে ডুবে মরবো।"

"বেশ। আমি যাচ্ছি, তুই দেখে নিস্ কি হয়।"

যামিনী ভয় পাইল না। অসহায়ের যে সাহস, সেই সাহসে বুক বাঁধিয়া সে অটল রহিল; এবং যখন দেখিল যে হরিচরণ

চা সত্যই নিঃশব্দে নৌকা হইতে নামিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া ল, তখন সে যেন একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন হইতে পরিত্রাণের শান্তি ১ভব করিল। বুঝিল না যে, তাহার অদৃষ্টাকাশের কোণে ড়র মেঘ উঠিল।

যামিনী এক একবার মনে করিল যে, হরিচরণ তাহাকে ভয় খাইবার জন্যই নামিয়া গিয়াছে; আবার হয়ত কিছুক্ষণ বাদে নুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। সে জাগিয়া অবশিষ্ট রজনী াহাইল; কিন্তু হরিচরণ আর ফিরিয়া আসিল না। উষার তাসে যামিনী ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন সে চক্ষু মেলিল, তখন ভোর হইয়াছে। মাঝিরা 'ঘোর' কিতে নৌকা খুলিয়াছিল। হরিচরণ যে নৌকায় নাই, তাহা তঃকালে তাহারা লক্ষ্য করে নাই। যখন লক্ষ্য করিল, তখন হারা অনেক পথ আসিয়াছে। যামিনী উঠিতেই তাহারা স্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিল অন্ধকার থাকিতে বাবু হয়ত কোনও প্রয়োজনে কূলে নামিয়া-লেন; তাহারা তাঁহাকে ফেলিয়াই আসিয়াছে। নিতান্ত পরাধীর মত তাহারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু মিনী যখন কোনই প্রশ্ন করিল না, তখন মাঝি জিজ্ঞাসা রিল—

"ঠারইন, আপনার ভাই গেল কোই?"

যামিনী উত্তর করিল—

"কি জানি, বাবা?"

মাঝি সভয়ে কহিল—

"নাও ফিরায়্যা লইমু ?"

"তোমরা ঘোষপুর চেন ?"

"চিনি মা ঠারইন। মুখুজ্জাদের বারীত যাইবা ত ?"

যামিনী "হাঁ" বলিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মাঝি তাহা দেখিল। হরিচরণ যে স্বেচ্ছায় তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে, এমন একটা সন্দেহ তাহার মনে হইল। কেন না, যদি তাহারাই ভুলক্রমে তাহাকে ফেলিয়া আসিত, তাহা হইলে সে ত ডাঙ্গাপথে অনায়াসে তাহাদের ধরিয়া ফেলিতে পারিত। ইচ্ছা থাকিলে, এখনও ত সে আসিতে পারে। মাঝি তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেলা যেমন বাড়িতে লাগিল, তাহার সে সন্দেহও ঘনীভূত হইল। যামিনী যে পুনঃ পুনঃ বসনে চক্ষু মুছিতেছে, তাহাতেও তাহার মনটা সেই সন্দেহের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

সে বলিল—

"মা ঠারইন, তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা মুখুজ্জাদের বারীত্ আপনারে উঠায়্যা দিয়া, তবে যাইমু।"

৪

জোয়ারের জলে নৌকা তর তর করিয়া চলিল। মধ্যাহ্নে ঘোষপুরের ঘাটে গিয়া মাঝিরা যখন নৌকা ভিড়াইল, তখন সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ স্নান করিতেছিল। তাহাদের

কলেরই দৃষ্টি প্রথমে নৌকা ও পরে আরোহিণীর দিকে বক্রভাবে র্পিত হইল। একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—

"কোথাকার নৌকা রে, মাঝি ?"

"যশপুরের লাও, মুখুজ্জাদের কুটুম বারীত্তে আস্‌ছি।"

যামিনী দেখিল, স্নাতকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ ব্রাহ্মণ ছলেন, তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া উপবীত হস্তে উর্দ্ধমুখে সূর্য্যপ্রণাম রিতে ব্যস্ত হইলেন। বধূগণ অবগুণ্ঠন আরও অবনমিত করিয়া াহার অন্তরাল হইতে যামিনীকে দেখিতে লাগিল; যামিনী সে টাক্ষ সহিতে না পারিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল। একজন মাঝি নৌকা হইতে নামিতেছে দেখিয়া জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোথায় যাও, বাপু ?"

মাঝি উত্তর করিল—

"মুখুজ্জাবারী।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—

"তোমাদের নৌকায় ত দেখ্‌ছি, একটি বউ এসেছে। আর ঙ্গে কেউ আসে নি ?"

"আজ্ঞা, আস্‌ছিল ঠারইণের এক ভাই না কি জানি হয়। া সে লাইম্যা গেছে পথে কোন্‌খানে, ট্যার পাই নেই।"

"নেমে গেছে, না রাত্রে তোমরা জোর করে তাকে নামিয়ে দিয়েছ ?"

"হেই কি কন্‌ করতা ? আমরা বার বচ্ছর এই অঞ্চলে

মাঝিগিরি কাম করতে আছি—আমরা কি এমন কাম করতে পারি, আজ্ঞা ?"

"সে আমরা আজ সকালে সব শুনেছি। তোমরা ও মেয়েটিকে নিয়ে সেই গাঁয়ে ফিরে যাও। তারা যা হয় করুক গে। রাধামাধব ! রাধামাধব !"

মাঝি বুঝিল। চলিতে যেন তাহার পা সরিতেছিল না। তবুও সে আস্তে আস্তে গ্রামের পথ ধরিয়া চলিল। যামিনী সকলগুলি কথা শুনিল, মাঝির চলিবার ভঙ্গী হইতে সে বুঝিল যে, সে বেচারীর মনে ভয় হইয়াছে। হরি দা আসিয়া এরি মধ্যে এতখানি কাণ্ড করিয়া যাইবে, ইহা সে তেমন ধারণা করিতে পারে নাই। তাহার বালিকা-হৃদয় চতুর্দ্দিক হইতে ঘনায়মান নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও আশার রঙ্গমশাল জ্বালিয়া মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল। কিন্তু ঘাটে আসিয়া নৌকা বাঁধিতেই তাহার সমস্ত আশা ভরসা লোপ পাইল; তাহার হস্তপদ ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণ ও মাঝিতে যখন কথাবার্ত্তা হয়, তখন সে তাহার সকলেন্দ্রিয় কর্ণে নিয়োজিত করিয়া তাহা শুনিতেছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি বাক্য, প্রতি বর্ণটি তাহার কর্ণে যেন অগ্নিশিখার মত দগ্ধ করিয়া প্রবেশ করিল; তাহার ক্ষুদ্র জীবনে এত তীব্র যন্ত্রণা কখনও তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। পিতৃহীনা হইয়াও সে এতদিন মায়ের বক্ষনীড়ে আদরে যত্নে পালিত হইয়াছিল, আজ তাহার অন্তরাত্মা নীড়ভ্রষ্ট পক্ষিশাবকেরই ন্যায় ছটফট করিয়া উঠিল।

বিবি বউ

গত রাত্রের ঘটনা দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। হরিচরণ যখন নিরুদ্ধ ক্রোধে তাহাকে ফেলিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যায়, তখন তাহার নিস্তব্ধ মৌন রুদ্র মূর্ত্তি অন্ধকারেও যেন বিভীষিকার মত দেখাইয়াছিল। সেই বিভীষিকার মূর্ত্তি আরও শতগুণ বীভৎস রূপ ধারণ করিয়া এখন তাহার মনে আসিতেছিল। তাহার মনে পড়িতেছিল, সেই চাপা গলার তীব্র ভৎর্সনা "তুই দেখে নিস্, দেখে নিস্ কি হয়"; অদৃষ্টের অভিসম্পাতের মত সেই কথা কয়েকটি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার বক্ষপঞ্জরের প্রতি অস্থিতে নির্ম্মম ভাবে আঘাত দিতেছিল। হরি দা তাহাকে সেই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অপরিচিত মাঝিদের দয়ার উপর ফেলিয়া গিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—তাহার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাহার উভয় কূলে কাঁটা দিয়া ছাড়িয়াছে। যদি শ্বশুরবাড়ীতে তাহাকে না লয়, মা তাহাকে কেমন করিয়া লইবেন? মা, মা আমি আর তোমার স্নেহ কোলে ফিরিতে পারিব না! এই জন্যই কি মেয়েকে এত সাজগোছ করিয়া শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলে, মা?

এইবার তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিল। মাঝি ফিরিয়া আসিয়াছে। সে হুঁকা কলিকা লইয়া তামাকু প্রস্তুত করিতে যেন ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক সে কোনও কাযই করিতেছিল না। বেচারী একটিও কথা কহিতে পারিতেছে না। তাহার কপোল বহিয়া

দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল রুক্ষ দাড়ীতে আসিয়া চক্ চক্ করিতেছিল। এতক্ষণ অপর মাঝিটা নৌকার পাটাতনে ডাল ও ভাত রন্ধন করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু খাইবার কথা কাহারও মনে নাই। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা কেহ জলস্পর্শও করে নাই। যামিনী চোখের জল নিরুদ্ধ করিয়া মাঝির মুখের দিকে চাহিল। মাঝি হুঁকা লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত টানিতে লাগিল। কলিকায় যে আগুন দিতে বাকী আছে, তাহা সে ভুলিয়া যায় নাই। কিন্তু দরিদ্র, অশিক্ষিত মুসলমান মাঝির প্রাণের গোপন কোণে কোথায় একটি কোমল স্থান ছিল, আজ তাহা এই নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণ বালিকার দুঃখে শত বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার দিকে চাহিতেও পারিতেছিল না। যামিনী চোখের জল মুছিয়া, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া, তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সে প্রশ্ন যামিনীর কণ্ঠেই মিলাইয়া গেল। মাঝি তাহার প্রশ্ন না বুঝিতে পারিলেও এটুকু বুঝিল যে একটা কিছু সত্য মিথ্যা বলা প্রয়োজন ; তাই সে উত্তর করিল—

"মুখুজ্জা মশায় বারীতে নেই, মা ঠা'রণ। আবার খানিক পরে যাইয়া দেখমু হ্যানে।"

এ আশ্বাসে যামিনী ভুলিল না। তাহার চোখ দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। মাঝির মুখ দেখিয়া আর বুঝিতে কিছু কি বাকী আছে ?

মাঝি আসল কথা বলিল না। মুখুয্যে মশায় বাড়ীতে ছিলেন

এবং তাঁহার পুত্রও উপস্থিত ছিলেন। মাঝি যখন তাঁহার সম্মুখে গেল, তখন তিনি প্রথমতঃ যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া পুত্রবধূর চতুর্দ্দশ পুরুষের সৎকার করিলেন; তার পর মাঝির পুরস্কার স্বরূপ খড়ম ছুঁড়িয়া তাহার দুইটি অঙ্গুলি রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছেন। পরে রাগে গরগর করিতে করিতে নগ্নপদেই তিনি অন্য প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিয়াছেন। মাঝি অনেকক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া নৌকায় ফিরিয়াছে। মাঝির মনের ভাব যে, মুখুয্যে মহাশয়ের রাগ একটু কমিয়া আসিলে তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, তখন সে একবার হাতে পায়ে ধরিয়া দেখিবে।

৩

অগ্রহায়ণের অপরাহ্নে নদীর বাঁকের শেষে বৃক্ষপুঞ্জের সবুজ আস্তরণের উপর সূর্য্যদেব শল্‌মাচুমকীর আসন রচনা করিয়াছেন। মাঝি আবার মুখুয্যে বাড়ী গিয়াছে। যামিনী তাহার পথ নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া আছে। অশ্রুজল তাহার দৃষ্টি শক্তিকে মাঝে মাঝে বড়ই বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। এমন সময় একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক একটি শূন্য মাটীর কলসী কক্ষে নৌকার উপর উঠিল এবং একটু নীচু হইয়া যামিনীর দিকে তীব্র ঘৃণামিশ্রিত বিদ্রূপের কটাক্ষ হানিয়া বলিল—

"কিগো, পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর মেয়ে, এখনও যে ঘাটে লালডিঙ্গি বেঁধে হাওয়া খাওয়া হচ্চে? কেলেঙ্কারীর কি শেষ হয় নি?"

যামিনী ভয় পাইল। সে আস্তে আস্তে এক কোণে গিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। আগন্তুক রমণী কোনও জবাব না পাইয়া বলিল—

"ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, এই যে গাঁ ঢিঢি শব্দ পড়ে গেছে, খবর রাখ কি? এখনও বলছি ভালয় ভালয় বিদেয় হও।"

যামিনী নিজের চিন্তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—

"কোথায় যাব, মা?"

"কেন, যমের বাড়ী নেই কি বাছা? বামুনের মেয়ে মরতে জান না? এতক্ষণ পাঁজর ভেঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গাঁয়ের অকল্যাণ না করে,' ঐ খান্‌টায় ডুবে মর্‌লে ত জঞ্জাল যেত গো! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বলে যাব কোথা? চুলোয় যা, চুলোয় যা।"

বলিতে বলিতে রমণী কলসীটি আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিলেন ও দ্রুতপদে নৌকা ত্যাগ করিলেন।

যামিনী অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, অলস। রমণী ঘাট হইতে অনবরত বকিতে বকিতে যখন চলিয়া গেলেন, তখন সে ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাঝিকে বলিল নৌকা কূল হইতে একটু সরাইয়া বাঁধিতে, যাহাতে সহসা কেহ নৌকায় না চড়িতে পারে। ঘাটে অনেক লোক আসিল, তাহার দিকে চাহিয়া কত কথাই কহিল, কত ইঙ্গিত বিদ্রূপ করিল, তার পরে গাত্র মার্জ্জনা করিয়া জলের কলসী কক্ষে লইয়া দেহ দোলাইতে দোলাইতে চলিয়া গেল। শেষে যামিনী আর তাহাদের পানে চাহিল না। যে মাঝি গাঁয়ের

মধ্যে গিয়াছে, তাহার প্রতীক্ষা করিতেও বিরত হইল। সে নৌকার জানালা দিয়া জলের দিকে অনিমিষে চাহিয়া রহিল। পরপারে চাষারা গরুবাছুর লইয়া নদী কিনারের পথ বাহিয়া চলিয়াছে, সে দিকে তাহার দৃষ্টিরেখা প্রসারিত হইল না। সে জলের খেলা দেখিতেছিল, কি চিন্তার দোলায় দোল খাইতেছিল, তাহা বুঝা গেল না। নৌকার যে দিক্‌টায় সে বসিয়া ছিল, সে দিকে নৌকা ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছিল। মাঝি সেই জন্য তাহার উলটা দিকটায় গিয়া বসিয়া নৌকার পাল্লা সমান করিয়া লইল।

দিক্‌চক্রবালের কিনারে রবির রশ্মি ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল, কালো জলে কালো অন্ধকার নিবিড় ঘন নীড় বাঁধিতেছিল। ছোট ছোট ঢেউগুলি চলৎ ছলৎ করিয়া নৌকার গায়ে খেলা করিতেছিল। যামিনী জলের দিকে চাহিয়াই আছে, কিন্তু কিছুই সে দেখিতেছে না; ভাবনার রাশি এলোমেলো হইয়া তাহার হৃদয়ে তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়াছে। সে ত কখনও ভাবিতে শিখে নাই; আজ সহসা ভাবনার অতিরিক্ত ভারে সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কপোল বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। ভাবিতেছিল, এইখানটাই অ-থই জল। এখানে ডুবিলে বোধ হয় কেহ উঠিতে পারে না। এই কালো জল, এর ভিতরেও বোধ হয় খুব আঁধার। কিন্তু খুব ঠাণ্ডা বোধ হয়! সব জ্বালা জুড়িয়ে যায় একবার ডুব্‌তে পার্‌লে। কিন্তু ডোবা কি যায়? বড় ভয় করে। এই জানলা দিয়ে স্বচ্ছন্দে জলে নাম্‌তে পারা যায়; কিন্তু বড় ভয় করে। আর যাবই বা কোথায়? মা!

মা! মায়ের কথা মনে হইতেই সে "মা-মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

"ভয় কি, যামিনী!"

যামিনী চমকিয়া উঠিল। এ কার স্বর? এ যে চেনা স্বর। ঐ ক'টি কথায় তাহার সমস্ত হৃদয় তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সে জানালা দিয়া মুখ ঈষৎ বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই স্বামী। নৌকার অপর দিকে লঘু হস্তে নৌকার কাঠ অবলম্বন করিয়া তাহার স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিতেছে। সে বিবাহের সময়ে ও পিতৃগৃহে অবস্থিতি কালে যে কয়েক দিন 'বর'কে দেখিয়াছিল, তাহাতেই সে চির সুন্দর মূর্ত্তি তাহার হৃদয়পটে চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়াছিল। আজ শ্যামায়মান সন্ধ্যার কালো জলে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

আজ সমস্ত দিন এবং গত রজনীতে সে জলস্পর্শ করে নাই। কলঙ্কগ্লানিতে তাহার বালিকা-হৃদয় অসহ দুঃখ ও ব্যথায় অরুণিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সব সে ভুলিয়া গেল। তৃষিতের মত অনিমেষ নয়নে সে তার স্বামীর দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্বামী সাঁতার কাটিয়া নিজের মস্তকটি কেবল জলের উপরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। নৌকার বিপরীত দিকে থাকায় অপর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ সেও স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে মুখে সে এমন কিছু খুঁজিতেছিল, যাহাতে এই রহস্যের একটা মীমাংসা হয়। তাহার বয়স মাত্র উনিশ কি কুড়ি বৎসর হইবে। কুলীনের ছেলে, অল্পবয়সেই

বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহাকে বালকের মত দেখাইতেছিল না। সে বড়ই গম্ভীর। সংসারে তাহার কথা কে শুনিবে? তাহার পিতার ব্যবহার দেখিয়া সে বুঝিয়া লইয়াছে যে যামিনীর পক্ষে তাহাদের গৃহের কবাট জন্মের মত রুদ্ধ। কিন্তু দোষ কার? এইটুকু শুধু সে বুঝিতে চাহে। অনেকের মুখে আজ বিকালে সে শুনিয়াছে যে চোখের জলে বধূর বুক ভাসিয়া যাইতেছে। আবার তাহার বিরুদ্ধে কত বিদ্রূপও শুনিয়াছে। তাই একবার ঘাট জনশূন্য হইলে, দূর হইতে সাঁতার কাটিয়া, ডুব মারিয়া সে নৌকার অপর দিকে আসিয়া নৌকা অবলম্বন করিয়া ভাসিতেছিল। শেষে বালকের মত সে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"হরি দা নৌকো থেকে নেমে গিছলো কেন?"

অন্য সময় হইলে যামিনী লজ্জায় স্বামীর কথার জবাব দিতেই পারিত না। ক আজ তার সকল লজ্জা টুটিয়া গিয়াছে। সে বলিল—

"হরিদার কথা শুনিনি বলে। তার মতলব……"—আর সে কিছু বলিতে পারিল না, উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

মাঝি একটু ঝিমাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মা ঠা'রণ কাঁদেন ক্যান্; কাঁদেন না। হে আল্লা!"

যামিনীর স্বামী যামিনীকে বলিল, "আমি আবার আস্‌ব। তুমি জেগে থেক।"

জলের একটু শব্দ হইল। আর তাহাকে দেখা গেল না।

৬

মাঝি যে কখন ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা যামিনী জানিতে পারে নাই। যে মাঝি নৌকায় ছিল, সে কখন নৌকা কূলে ভিড়াইয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করে নাই। মাঝি মুখুয্যেদের বাড়ী হইতে শুধু প্রত্যাখ্যানের দুরন্ত অপমানের বোঝা মস্তকে লইয়া ফিরিয়াছে। তাহার কর্ত্তব্যের একটু মাত্র শেষ রাখিয়া সে ফিরে নাই। কাকুতি মিনতি, হাতে পায়ে ধরা সে নিরক্ষর মাঝির শক্তিতে যতদূর কুলায়, তাহার ত্রুটি সে করে নাই। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের শৈলসম মর্য্যাদা কি শুধু তাহাতে প্রবোধ মানে? সে প্রত্যুত্তরে শুধু শক্ত কথা শুনিয়া, গালাগালি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

"অখন্ কি করমু, করতা?" এবং তাহার উত্তরে যখন শুনিল—

"ঘরে নিয়ে গিয়ে নিকা কর্ গে হারামজাদা।"

তখন তাহার ধৈর্য্য আর টিকিল না। সে আপন মনে বকিতে বকিতে নৌকায় ফিরিয়া আসিল। সমস্ত দিবসের ক্লান্তির পরে সে ভাল করিয়া একবার তামাক খাইল এবং সঙ্গীকে ডাকিয়া ভাত বাড়িতে বলিল। তাহার চেষ্টার যে ত্রুটি হয় নাই, শুধু এই ধারণাটুকুতে তাহার মন কতকটা হাল্কা হইয়াছিল এবং নৌকায় ফিরিয়া যখন সে কেরোসিনের

কুপের আলোকে দেখিল যে মা ঠাকুরাণীর চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে—তখন সে মনে কিঞ্চিৎ বল পাইল। বলিল—

"ভাত কয়ডা খাইয়া লই, তার পরে নাও খুলিয়া দিমু হানে?"

যামিনীর যেন চমক ভাঙ্গিল। সে যে দুরন্ত বিষাদের মধ্যেও একটু শান্তির স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা যেন টুটিয়া গেল। সে ত্রস্তব্যস্তভাবে বলিল :—

"না, না, মাঝি, আমি আজ রাত্রে কোথাও যাব না। কাল ভোর বেলা নৌকো খুলে দিও, বাবা।"

মাঝি অবাক হইল। ভাবিল, বোধ হয় সে কাল সকাল-বেলা নিজে একবার উঠিয়া চেষ্টা করিবে কি না, ভাবিতেছে। তা মন্দ কি? সে শুধু সঙ্গীকে বলিল, "নাও বার দে।"—অর্থাৎ বাহির জলে নৌকা বাঁধিতে বলিল।

মাঝিরা খাওয়া দাওয়া করিয়া, কাপড় মুড়ি দিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

জল স্থল সব নিস্তব্ধ। বাতাসের গতিও যেন রুদ্ধ হইয়াছে। মাঝে মাঝে তালে তালে দাঁড় ফেলিয়া দুই একখানা নৌকা এদিকে ওদিকে যাইতেছে। যামিনী ঘুমায় নাই। সে ভাবিতেছিল, এমন জনমানবশূন্য স্থানে, এই গভীর রাতে, তাহার স্বামী কি আসিবেন? যামিনীর বড় ভয় করিতেছিল। যদি তিনি না আসেন; তাঁহার বোধ হয় আসিতে ভয় করিবে। তবে, তিনি ত আর তার মত অসহায়া, অবলা নহেন; পুরুষ

মানুষের বোধ হয় ভয় করে না। এইরূপ কত কথাই সে ভাবিতেছিল। পঞ্চমীর চন্দ্র অস্ত যাইবার জন্য আকাশের গায়ে তাহার ক্ষীণ দেহখানি হেলাইয়া দিয়াছেন। তারাগুলি যেন ভয়ে, ভয়ে, ঢেউয়ের সিঁড়ি বাহিয়া নদীর জলে নাহিতে নামিতেছে। যামিনী তীরের দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছিল। কোনও কিছুর শব্দ হইলেই ভাবিতেছিল, এইবার তিনি আসিতেছেন। শব্দ না হইলেও মনে করিতেছিল, বুঝি ঐ শব্দ পাওয়া যাইতেছে। আবার ভাবিতেছিল, গুরুজন যদি জাগিয়া থাকেন, তবে তিনি আসিতে পারিবেন না। বোধ হয় তাঁহার আসিতে কোন বাধা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তবে বলিয়া গেলেন কেন "জেগে থেকো, আমি আবার আসবো।" ঐ কটি কথা সন্ধ্যা হইতে সে যে কতবার মনের মধ্যে দারুণ আবেগে চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার সমস্ত সত্ত্বা যেন ঐ কয়েকটী কথার মধ্যে আজ সন্ধ্যাবেলা হইতে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

যামিনী তীরের দিকে খেজুর গাছের পুঞ্জের মধ্যে অন্ধকারময় পথে তাহার স্বামীর দেহচ্ছায়া খুঁজিতেছিল। কতক্ষণে এই পথে পদধ্বনি হইবে, সে উৎকর্ণ হইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। কেরোসিনের আলোকটি সে অনেকক্ষণ নিবাইয়া দিয়াছে, নৌকায় আলোক থাকিলে বাহিরের জিনিস লক্ষ্য হয় না। তাহার উৎকণ্ঠিত হৃদয়েরই মত নৌকাখানি মাঝে মাঝে দুলিয়া উঠিতেছিল। একবার মনে হইল যেন নৌকা এক দিকে কিছু

হেলিয়া পড়িল। যামিনী নদীর দিকে ফিরিল। দেখিল, জানালায় হাত দিয়া তাহার স্বামী। জল হইতে মাথা তুলিয়া সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া যামিনী দৃষ্টিশক্তি অভ্যস্ত হইয়াছিল বলিয়াই সে এত সহজে চিনিতে পারিল। তথাপি ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর যেন হিম হইয়া গেল।

তাহার স্বামী জিজ্ঞাসিল, "ঘুমাও নি?"

যামিনী অতি কষ্টে বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "জলে কেন? অসুখ করবে যে! উঠে আস্‌বে না?"

অগ্রহায়ণ মাসের রাত। রাত্রিতে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বোধ হয়। এমন গভীর রাতে কি কেউ জলে থাকিতে পারে? তবে বুঝি নৌকায় আসিতে বাধা আছে। সে যে কলঙ্কিনী, তাহার নৌকায় উঠিলে পাছে জাতি যায় বলিয়াই কি এই হিমের রজনীতে এত কষ্ট করিয়া দেখা দিতে আসা? যামিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল।

তাহার স্বামী বলিল, "কাল যশপুরে কখন পৌঁছুবে?"

"কি জানি? যশপুর যাব না।"

"কেন? মায়ের কাছে যাও। এখানে এরা তোমায় নেবে না।"

"ওগো আমার অপরাধ কি?"—যামিনীর চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল।

উত্তর হইল, "তা কি জানি?"

"না, বলো। তোমার দুটী পায়ে পড়ি। আমি ত কারু মন্দ করি নি।"

"তোমার জাত গেছে। মাঝিদের ভাত খেয়েছ—তাদের জাত দিয়েছ।"

"তুমি কি বিশ্বাস করো?"

"না।"

"তবে আমায় এত কষ্ট দাও কেন? আমি মরি যে।"

"আমি কি করব, বল!" কণ্ঠস্বরে বিষাদের আভাস ছিল।

"এখন আমিই বা কি করি?"

যামিনী কাঁদিতেছিল। সে সরিয়া জানালার নিকট গিয়াছিল। তাহার গায়ে তাহার স্বামীর নিঃশ্বাস অনুভূত হইতেছিল। বড় ইচ্ছা যে অঞ্চল দিয়া সে তাঁহার সিক্ত মুখখানি মুছাইয়া দেয়। ভাল করিয়া ত দেখিতে পাইতেছিল না। একটু স্পর্শের দ্বারা সে অভাব পূরণ করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু পাছে তাহার অপবিত্র স্পর্শে স্বামী সংকুচিত হন, এই ভয়ে সে পারিতেছিল না।

স্বামী বলিল, "তুমি তোমার মায়ের কাছেই যাও।"

যামিনী উত্তর করিল, "তিনিই কি আমায় আর ঘরে নেবেন?"

"আমিও তাই ভাবছি।"

"ওগো বল, এখন আমি কি করব?"

"তুমি কিছু ভেবেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কি ভেবেছ?"

"মরব।"

"পারবে ?"

"কেন পারব না ?"

"ভয় করবে না ?"

"বামুনের মেয়ে মরতে ভয় করবে ? আমার যে কোনও কূলেই দাঁড়াবার স্থান নেই !"

"দূর ! মরতে নেই ।"

"তবে কি করব ? বল, তোমার পায়ে পড়ি। আমায় পায়ে রাখ ; আমায় বাঁচাও ।"

"আমি যা বলি, পারবে ?"

"হাঁ পারব ।"

"ভয় করবে না ?"

"না ।"

"ঠিক বল্‌ছ ?"

"হাঁ, ঠিক বল্‌ছি ।"

"তবে নেমে এস আমার সঙ্গে। তোমায় নিয়ে আমি এক যায়গায় চলে যাব ।"

"কোথায় ?"

"সে অনেক দূরে ।"

"আমি যে সাঁতার জানি নে ।"

"আমি খুব ভাল জানি। এখনি পার হতে হবে ; শীঘ্র এস। মাঝিরা জাগলে আর হবে না। বুঝলে ?"

যামিনী আর ভাবিল না। ভাবিয়া ভাবিয়া সে অবসন্ন

হইয়া পড়িয়াছিল। আর ভাবিবার ক্ষমতাও তাহার ছি সে কাপড়খানি কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া লইল, জানালা দিয়া পা গলাইয়া জলের শীতল স্পর্শে তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর অনাবৃত দেহের আলিঙ্গনে সে নিজের দেহ সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দিল। যামিনীর স্বামী তাহাকে পিঠের উপর তুলিয়া, নিজের গামছার দ্বারা উভয়ের কোমরে বেশ করিয়া জড়াইল। তার পর তাহারা তারার আলোর মাঝখান দিয়া ভাসিয়া চলিল।

*　　*　　*

পরদিন প্রভাতে কৃষকেরা দেখিল, চরের উপর দুইটি প্রাণী নিবিড় আলিঙ্গনে চিরশান্তিতে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

ঝি

তার নাম ছিল মতি। পূরা নাম ছিল, হরিমতি বা এমনই একটা কিছু। কিন্তু সকলে তাহাকে 'মতি' বলিয়াই ডাকিত। সে গরীবের মেয়ে; কিন্তু যার হাতে পড়িয়াছিল, তার সংসারে কোনওদিন মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কষ্ট ছিল না। বিবাহিত জীবনের দশটি বছর তার পক্ষে সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু বিধাতা একদিন নিমেষের ফুৎকারে সে তাসের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন—মতি বিধবা হইল।

তার স্বামী কলিকাতায় এক তেল-কলে চাকরী করিত। মাসে মাসে যে কয়েকটি টাকা বাড়ীতে পাঠাইত, তাহাতেই তাহার ও তাহার শাশুড়ীর স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। এ ছাড়া তাদের ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের সব্জী সবই ছিল। কিন্তু মতি দেখিল যে ভাঁটার টানে নদীর জল যেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে সরিয়া যায়, তেমনি তাহাদের ছোট সংসারটির লক্ষ্মী-শ্রী ক্রমশঃই চলিয়া যাইতে লাগিল—কোনও চেষ্টায় কিছু করিতে পারা গেল না। প্রথমে গেল গহনা ক'খানি, তার পরে গেল জমিটুকু, সবজীর বাগান জঙ্গলে ভরিয়া গেল—গোয়ালে মরিল গরু! শাশুড়ী কাশ-রোগে ক্ষয় পাইতে লাগিলেন। মতি ভাবিয়া স্থির করিল যে, ভাবিয়া কোনও ফল নাই; সকলই যাইতে বসিয়াছে।

সে একটি বিষয়ে কিছু নূতনত্ব লক্ষ্য করিল—প্রতিবেশী তাহার প্রতি কিছু অতিমাত্রায় স্নেহপরবশ হইয়া পড়িল। সকালে সায়াহ্নে, দিবা দ্বিপ্রহরে হিত-কামীরা নানা ছলে তাহাদের খোঁজ লইতে আসে এবং কি উপায়ে তাহাদের একটু উপকার করিবে, তাহারই চেষ্টায় তৎপর। অর্থের দরকার অমনি পুঁটুলি করিয়া টাকা সিকি, দুয়ানি আসিয়া উপস্থিত। তবে, পাছে অরক্ষিত অবস্থায় মতির মূল্যবান গহনাগুলি যায়, এজন্য উপকারী মহাশয় আবার সেই পুঁটুলিতে বাঁধিয়া গহনাগুলি নিজগৃহে লইয়া সাবধান করিতে ভুলিলেন না! অপর এক বন্ধু কৃপা করিয়া খামার জমিটুকু বন্ধক রাখিলেন—পাছে আর কেহ তাহাদের অসময় বুঝিয়া ঠকাইয়া লয়! মতি এই সকল বন্ধুর উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মতির বয়স ২২ বৎসর; তাহার শাশুড়ী মনে মনে বলিলেন, "পোড়ার মুখীর রূপই কাল হইয়াছে।"

শাশুড়ীকে বেশীদিন ভাবিতে হইল না। বর্ষায় তিনি রসে ফুলিয়া পড়িলেন এবং শীত কালের প্রথমেই অগ্রসর হইলেন। মতি একদিন দেখিল, সে সেই ভাঙ্গা সংসারের মাঝখানে নিতান্তই খাপছাড়া রকমে একা হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুরা সকলেই আশ্রয় দিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সে যে কাহাকে বাছিয়া লইবে, তাহা স্থির করিয়াই উঠিতে পারিল না। আগ্রহ কাহারও কম নহে; কেহ কেহ কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য অর্থ ও অলঙ্কার লইয়া হাজির!

মতি গৃহ-কোণে গিয়া তার পুরাতন আরসী খানিকে হাই

দিয়া, আঁচলে ঘসিয়া একবার সম্মুখে ধরিল; একটুখানি হাসিয়া দেখিল, কেমন দেখায়; তার পরেই আরসী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। আরসীখানি কপাটে লাগিয়া ছাতু ছাতু হইয়া গেল।

যে সকল প্রতিবেশী সময়ে অসময়ে আত্মীয়তার আব্দারে মতিকে বিব্রত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার নাম প্রহ্লাদ সা। তিনি গ্রামের জমিদার মুখুয্যে বাবুদের মুচ্ছুদ্দি। তাঁহার বয়স ৫০ পার হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাকে ৩৫এ আনিয়া দাঁড় করাইতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার আকৃতি ছিল কিঞ্চিৎ খর্ব্ব; স্থূলোদর, ক্ষুদ্রমস্তক ও গ্রীবালোপ হেতু তাঁহাকে একটি পরিপুষ্ট যবের মত দেখাইত। কিন্তু কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিত না; কেন না তিনি ধনী এবং কূটনীতিতে অদ্বিতীয়। মতি তাঁহার উপদেশ ও অনুশাসন প্রতিদিন গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য হইত।

শাশুড়ী যে দিন মারা গেলেন, তাহার পরদিনই শশী নাপিতানী তাহার তিন চারিটি শিশু শাবক লইয়া মতির গৃহে আবির্ভূত হইল—'সা মহাশয় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সোমত্ত বিধবা; একলা কি থাকে? ছিঃ।' সংক্ষেপে এই কৈফিয়ৎ দিয়া সে মতির শয়ন গৃহের এক পার্শ্বে বিছানা বিছাইয়া লইল। যাহা হউক, একটি সঙ্গী তবু ত জুটিল, এই মনে করিয়া মতি একটু আশ্বস্ত হইল। মতির আর আর প্রতিবেশীরা ভ্রূকুটী করিল, কিন্তু মতি কি 'সরকার' বাবুর অমতে কোনও কিছু করিতে পারে?

নাপিত বৌও মতিকে বিধিমত ভাবে সেই কথাই বুঝাইল, "সরকার বাবুর অমতে কাজ করিয়া কি কেহ কখনও জিনিতে পারে, না এ পর্য্যন্ত পারিয়াছে?" সে যে কত বড় হুকুমের বলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দাসেদের সংসারে আসিয়াছে, তাহা প্রতিদিন শতবার করিয়া মতিকে বুঝাইয়া দিতে ছাড়িত না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তার কাজ ছিল কারণে অকারণে সন্তানগুলিকে প্রহার ও জ্ঞাত-অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্দেশে গালি বর্ষণ করা। শশীর আগমনের একটি ফল হইল এই যে, কিছু-দিনের মধ্যেই হিতৈষী প্রতিবেশিগণের অনেককেই ভিন্ন রাস্তা দেখিতে হইল।

শশী দিন কতকের মধ্যেই বেশ জমাইয়া লইল। মতি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইল। ঠিক কোন্ দিন কেমন করিয়া যে শশী গৃহিণীর পদ গ্রহণ করিয়া মতিকে একেবারে দাসীত্ব প্রদান করিয়া ফেলিল, তাহা মতি কোনও মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মতি দেখিল যে, শশীর ছেলে মেয়েকে পালন করাও তাহার একটি কাজের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেটি সে অবহেলা করিলে যথেষ্ট গঞ্জনা ভোগ করে।

অন্যান্য লোকের গতায়াত যেমন কমিয়া আসিতে লাগিল, প্রহ্লাদ সা তেমনই ঘন ঘন খোঁজ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশ চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রধান শ্রোতা অবশ্য শশী; মতি জগৎ-সংসারের গতিক ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত। সরকার

বাবুর বিরক্তির ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার উপদেশের ফলশ্রুতি স্বরূপ বাম হস্তে কিঞ্চিৎ মুদ্রা লইয়া, দক্ষিণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ও বাম চক্ষু ও ভ্রূ ঊর্দ্ধে উঠাইয়া মতিকে দিতে আসিতেন, তখন মতি নিতান্ত জড়সড় হইয়া সরিয়া পড়িত এবং শশীকেই অগত্যা সে মুদ্রার ভার গ্রহণ করিতে হইত। খরচ তাহাতেই চলিয়া যাইত।

মতি আর একটি বিষয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল; সেটি কিছু বিলম্বে ঘটিল। শশী যখন সরকার বাবুর গুণ ব্যাখ্যান আরম্ভ করিত, তখনই চট্ করিয়া মতির মাথা ধরিত; আর সে পুকুর ঘাটে চলিয়া যাইত অথবা শুইয়া পড়িত। কাজেই শশী কথা ছাড়িয়া ঝাঁটা ধরিত—সেটা অবশ্য তার ছেলে মেয়ের পিঠেই পড়িত। একদিন কিন্তু সে বলিয়া ফেলিল, "দেখ, ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, দিন ত বেশ চলে যাচ্ছে; দুই হাত পেতে টাকাও নেওয়া হচ্ছে, দু'বেলা রাশ রাশ ভাতও উঠ্‌ছে। কিন্তু যে মানুষটা এত কচ্চে, তার পানে একবার তাকাতে হয় গা? সে কি শুধু তোমার ঐ ন্যাকামি ঠাট্ দেখ্‌বার জন্য এতগুনো করে টাকা গুণে দিচ্ছে? তুমি ত কচি খুকীটি নও বাছা।"

মতি একটু হাসিল, বলিল, "তাই নাকি, নাপ্তে বৌ? আমি ভেবে ছিলাম তোমার জন্য টাকা আস্‌ছে।"

নাপিত-বৌ রাগিয়া গেল। বলিল, "আস্‌চে ত। একশ' বার আস্‌চে। তাও বলি, লোকে যে কি দেখে ভোলে, তা বোঝা ভার! এক দিন দিন ছিল গো, দিন ছিল, তখন ঐ সরকার বাবুই—"

সে ইতিহাস আর মতির শুনা হইল না। সরকার বাবু স্বয়ং আসিয়া পড়িলেন। উপদেশের পালা আরম্ভ হইল। মতি দরজার এক কোণে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন চাকরের মাথায় একটি ডালা শাক-তরকারী-পান ইত্যাদি লইয়া যখন প্রহ্লাদ সা দ্বিপ্রহরে মতির বাড়ীতে আসিলেন, তখন সেখানে সন্তানগণ-পরিবৃতা শশী ব্যতীত আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। শশী বেশ নিশ্চিন্ত মনে রন্ধন করিতেছিল, সরকার বাবুর যত্নের কোনও ত্রুটী হইল না; কেবল অভাব ও অভিযোগের মধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, মতি রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বে গৃহ ত্যাগ করিয়াছে।

সরকার বাবু অবশ্য বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শশী একটু সলাজ হাসি হাসিয়া, বাম হাতের পৃষ্ঠ দিয়া ঘোমটা একটু টানিয়া বলিল, "যাবে কোথায়? বাছাধনকে আসতেই হবে! শশী নাপ্‌তিনী তেমন মেয়ে নয়!"

শশীর কথা ফলিয়াছিল; কিন্তু বড় বিলম্বে।

মতি রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বেই কলিকাতার রাস্তা ধরিয়াছিল। তাহাদের গ্রাম হইতে কলিকাতা ১৫ মাইলের বেশী নয়, কিন্তু তাহার আসিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। কখনও ত হাঁটা অভ্যাস নাই; তারপর পৌষের বেলা, দেখিতে দেখিতে হেলিয়া পড়িল। মতি এক বুদ্ধি করিয়া ছিল—সে এক-কাপড়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল এবং সে কাপড় খানাও ময়লা। ঘোম্‌টা একেবারে বর্জ্জন করিতে না পারিলেও, তাহার দ্বারা শুধু খোঁপাটি ঢাকিয়া ছিল।

পল্লী-বধূর সলাজ ভাবকেও সেই সঙ্গে সে বিদায় দিয়াছিল। নিতান্ত সপ্রতিভের মতই সে পথ চলিতে লাগিল, এবং পথটি যেন তাহার চিরাভ্যস্ত, এমনই ভাবে সে চলিল। সংকোচের কোনও চিহ্নমাত্র তাহার মধ্যে ছিল না। অন্য পথবাহীরা অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে ইতস্ততঃ না করিয়াই তাহার জবাব সংক্ষেপে দিয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিত; পরক্ষণেই হয়ত তাহার সমস্ত শরীর মথিত করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইত। অভাগী নিজেই ভাল করিয়া জানিত না সে কোথায় যাইতেছে, তা' অপরকে বুঝাইবে কি? সে একটি বিষয় স্থির বুঝিয়াছিল যে, প্রহ্লাদ সা'র হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে একমাত্র উপায় হইতেছে—রুই নগর ত্যাগ, এবং অতি দুঃখেই তাই সে স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে।

মতি পূর্ব্বে দুই চারি বার কলিকাতায় আসিয়াছে এবং কালী-ঘাটে বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিয়াছে। এখন সে কালীঘাট লক্ষ্য করিয়াই আসিতেছিল। কালী বাড়ীতে পৌছিতে তাহার বেশী বেগ পাইতে হয় নাই, কেন না কালীঘাটের কাছা কাছি আসিয়া সে আরও যাত্রী দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহাদেরই সঙ্গে জুটিয়া কালী বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

নাট মন্দিরে গিয়া সে গলায় অঞ্চল দিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিল। এতক্ষণ সে যে একটা কৃত্রিম বাঁধ দিয়া রাখিয়া ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চোখের জল ছুটিল। সে তাহার

স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া মায়ের উদ্দেশে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল যে, সেখানে আরও লোক রহিয়াছে, সে আপনাকে অতি কষ্টে সামলাইয়া লইল। সেই সময়ে নাট মন্দিরে একজন বর্ষীয়সী মালা ফিরাইতেছিলেন, তিনি মালাটি পাঁচ সাতবার মাথায় ঠেকাইয়া উঠিলেন এবং মতির নিকটে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে? কপাল ভেঙ্গেচে বুঝি?"

মতি মাথার কাপড় টানিয়া মাথা হেলাইয়া জবাব দিল।

"কে আছে?"

"কেউ নেই, মা।"

"কেউ নেই? কোথায় যাবে তবে?"

"চাকরি করবো।"

"কি জাত তোমরা বাছা?"

"আমরা কৈবত্ত।"

"ঝি থাকবে? মন ঠিক করে থাকতে পারবে? তোমার যে বয়স দেখ্‌ছি বাছা, চেহারাটাও মন্দ নয়—কিছু মনে কর না বাছা! এ কালীঘাট বড় কঠিন ঠাঁই। দুদিনের মধ্যে কু-লোকের পরামর্শে হয় ত খেয়াল ঘাড়ে চাপবে এখন। তখন কি আর তিন টাকায় পোষাবে, বাপু?"

মতি একবার দেবীমূর্ত্তির দিকে চাহিল। যেন মনে বল পাইবার জন্য দেবতাকে স্মরণ করিল। সে শুধু বলিল, "না; আমি চাকরিই করব। তিন টাকাতেই আমার চলবে।"

অপরিচিতা তখন পুনরায় জপে মন দিলেন। সন্ধ্যা আরতি যখন শেষ হইল, তখন তিনি প্রণাম করিয়া উঠিলেন এবং মতিকে সঙ্গে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। অনেক গলি অতিক্রম করিয়া তিনি একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন ও তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "নিস্তার, ঝি রাখবি? তিন টাকা আর খোরাক পোষাক, আর জল খাবার চার আনা। রাখ্‌বি?"

নিস্তারিণী দোতলা হইতে জবাব দিলেন, "রাখ্‌ব দিদি! উপরে নিয়ে এস। এই পটলা, আলো ধর্‌ রে, আলো ধর্‌।"

দ্বিতলে উঠিয়া মতি নিস্তারিণীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। নিস্তারিণী কিছুক্ষণের মধ্যে কথা কহিতে পারিলেন না; শেষে বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তুমি ঝি থাক্‌বে?"

মতি কথা কহিবার পূর্ব্বেই নিস্তারিণীর দিদি বুঝাইয়া দিলেন "অল্প দিন হ'ল বেচারার কপাল ভেঙ্গেচে। ত্রিকূলে কেউ নেই কিনা; গেরস্তর বৌ; অবস্থা ভাল ছিল, তা দেখলেই বোধ হয়; সীঁথের সিন্দুরের সঙ্গে সঙ্গে মা-লক্ষ্মী অন্তর্ধান হয়েচেন। বাড়ী ভাড়া দিতে পাচ্চে না, দিন চলে না; তাই কালী বাড়ীতে এসে আমার কাছে কেঁদে পড়েচে, আমি ভাবলুম্‌ নিস্তারের ত ঝি চাই। তাই নিয়ে এলুম।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তা বেশ করেচ, দিদি। তা বাছা তুমি স্থির হয়ে থাকতে পারবে ত?"

এবারেও জবাব দিলেন তাঁহার দিদি, "সে আমি খুব বুঝিয়ে বলেছি। দেখ বাবু, যদি ভাল হয়ে থাকবে ত এমন

যায়গা কলকাতা সহরে আর পাবে না। চিরকাল কাটাতে পারবে ; শেষ কালে গঙ্গা লাভ হবে, গতি হবে—" "নারায়ণ, নারায়ণ," বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের শেষ কালের গতির চিন্তায় কিছু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

নিস্তারিণীর দিদির ওকালতীর গুণেই হউক, বা 'গরজ বড় বালাই' বলিয়াই হউক, মতি চাকরী পাইল। কিন্তু নিস্তারিণী যে খুব প্রসন্ন হইলেন না, তাহা বেশ বুঝা গেল। নিস্তারিণী একটু বেশী রকমের মোটা, তাঁহার স্বামী একটু বেশী রকমের রোগা। কিন্তু বুদ্ধি ছিল ঠিক ইহার বিপরীত অনুপাতে; অর্থাৎ নিস্তারিণী ছিলেন চতুরা এবং তাঁহার স্বামী জনার্দ্দন ছিলেন—বেজায় ভাল মানুষ। এই সকল কারণে তাঁহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের বড় সদ্ভাব ছিল না।

দিন কতক যাইতে না যাইতে নিস্তারিণী মতির প্রতি অযথা শাসন এবং স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত সতর্কতার ব্যবস্থা করিলেন। মতি বুঝিল, বুঝিয়া হাসিল। একদিন নিস্তারিণী মতিকে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন—"দেখ বাবু, ঝি বৃত্তি করতে এসেছ, ঝিয়ের মতই থাক্‌বে। অমন বেহায়াপানা আমার বাড়ীতে চল্‌বে না। আমি বসে বসে সব দেখতে পাই।"

মতি শুনিল। পরদিন গৃহকর্ম্ম সারিয়া সে গঙ্গা স্নানে গেল; আর ফিরিল না।

আবার আর এক বাড়ীতে তাহার চাকরী জুটিল। সেখানেও তাহাকে লোকে শান্তিতে থাকিতে দিল না। সে

জানিত যে রূপ যৌবন লইয়া সে যেখানে যাইবে, সেখানেই তাহাকে কিঞ্চিৎ উপদ্রব সহিতে হইবে। কিন্তু একান্ত বাড়াবাড়ি না হইলে, সে কোনও মতে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারিবে, এই ছিল তাহার বিশ্বাস। সে একটু আধটু গোলযোগে বিচলিত হইত না।

সে এবার যে বাড়ীতে চাকরী পাইয়াছিল, সে বাড়ীর কর্ত্তা বলরাম চাটুর্য্যে ব্যাঙ্কে চাকরী করিতেন, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। সংসারে অনেকগুলি লোক খাইত, মতি সকলের বাসন মাজ্জিত। কোনও রূপে আপনাকে ছাই ভস্ম আবর্জ্জনারাশির মধ্যে দিবারাত্র নিমজ্জিত রাখিয়াও সে লোকের দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। মনিব ও তাঁহার ভ্রাতাটি মতির প্রতি একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। বলাই বাবু রুই নগরের মুখুয্যেদিগের কুটুম্ব এই পরিচয় প্রদান করিয়া মতির সহিত ঘনিষ্ঠতা জমাইতে চেষ্টা করিলেন। মতি এখানেও প্রমাদ গণিল; সুতরাং আবার সে পলাইল।

সেই গলির মোড়ে একখানি বাড়ীতে সে দ্বিপ্রহরের বিজনতা খুঁজিয়া প্রবেশ করিল। গৃহিণী ছাতে বসিয়া রোদে চুল শুকাইতেছিলেন। মতি আস্তে আস্তে গিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাও, বাছা তুমি? কোথা হতে আসছ?"

মতি বিনা আড়ম্বরে বলিল, "আপনি ঝি রাখ্‌বেন, মা?"

"তুমি ঝি থাক্‌বে ?"

"হ্যাঁ মা, আমি গতর খেটেই খাই।"

এই সরল উত্তরে গৃহিণীর চোখের কোণ একটু স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার ঝিয়ের দরকার আছে বটে; কিন্তু তোমার বয়েসটা বড় কাঁচা। তুমি আগে কোন বাড়ীতে ছিলে ?"

মতি নিঃসঙ্কোচে বলিল, "এই গলিতেই চাটুয্যে বাবুদের বাড়ীতে ছিলাম।"

"কেন ছেড়ে এলে ?"

"মা, ঐ বয়েসটা কাঁচা বলেই আমার কোথায়ও গিয়ে সোয়াস্তি নেই।"

"তা এ বাড়ীতেই কি সোয়াস্তি হবে ?"

"তুমিই বুঝে দেখ, মা; যদি সোয়াস্তি না হয়, তবে আর কোথাও গিয়ে ভাগ্য পরিক্ষে করে দেখ্‌তে হবে।"

মতি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল। গৃহিণী একটু ভাবিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, হতভাগিনীর জীবনের অন্তঃস্রোত কি দারুণ ব্যথা ও বাধার মধ্য দিয়া বহিতেছে। তিনি বলিলেন,

"আচ্ছা থাক ত, তারপর তিনি আসুন, জিজ্ঞেসা করে' বল্‌ব তখন।"

গৃহস্বামীর নাম সুচারু গাঙ্গুলী; ইনি কারবার করেন। সকালে, দুপ'রে বিকালে সন্ধ্যায় সর্ব্বদাই ইনি বাহিরে বাহিরে ঘুরেন। স্ত্রীর সহিত রাত্রে যখন দেখা হয়, তখন কাহারও

বড় ঘুমাইতে বাকী থাকে না। মতি সারাদিন ঘর ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত। বাবুর খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া বামুন ঠাকুর যখন প্রস্থান করিত, তখন মতি ঘুম-চোখে তাহার কাজ সারিয়া শুইয়া পড়িত। এ বন্দোবস্ত তাহার মন্দ লাগিল না।

সুচারু সংসারের কোনও খোঁজই রাখিতেন না। সকল কাজই তাঁহার পত্নী সরলা নির্ব্বাহ করিতেন। মতির সম্বন্ধে পতির নিকট তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। প্রথম প্রথম সুযোগ হয় নাই, তারপরে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন একটু গোল হইল। সুচারু অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছেন। চাকর অসুস্থ, গাড়ী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সরলা মতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মতি, দোরটা খুলে দিয়ে এস ত।"

মতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি দেব মা?"

সরলা বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তুই-ই খুলে দিয়ে আয়।" মতি দরজা খুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। সিঁড়িতে আলো ছিল। সুচারু মতির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন; "কি বাবা, বাড়ী ভুল করিনি ত! তুমি কে বট সুন্দরী?"

মতি লজ্জায় দেয়ালের গায়ে মিশিয়া যাইতে চাহিল, সরলা সিঁড়ির উপর হইতে বলিলেন, "আচ্ছা, হয়েচে। উঠে এস এখন, ঝিয়ের সঙ্গে কথা কইতে জান না?" সুচারু অপ্রতিভ হইয়া টলিতে-টলিতে উপরে উঠিলেন।

সরলা কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছিলেন যে, আজ পানীয়ের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। মতি ভাবিল, "এ কোথায় এলাম!"

উপরে উঠিয়া সুচারু অপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কে গা?"

গৃহিণী বলিলেন "ওর নাম মতি।"

"ঝুটো, না সাচ্চা?"

সরলা বলিলেন "খুব সাচ্চা। দেখে নিও এখন।"

সুচারু পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, মতি জড়সড় হইয়া উপরে উঠিতেছে। তারপরে অকম্পিত গম্ভীরস্বরে বলিলেন "আমার ঘাট হয়েছে, মা; আজ আমার মাথাটা ঠিক নেই কি না, কিছু মনে করিস্ নি যেন! আমাদের জাত দাসীকে দাসী বলে না 'ঝি' বলে; ঝি অর্থাৎ মেয়ে। তুই আমার মেয়ের মতই থাক্, যা শুয়ে পড়গে; অনেক রাত হয়ে গেছে।"

সরলা খুসী হইলেন এবং স্বামীর জামা জুতা ছাড়াইতে ব্যাপৃত হইলেন। মতি চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া গেল; তাহার বিশ্বাস ধাক্কা খাইয়া খাইয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষকে অবিশ্বাস করাই তাহার স্বভাব হইয়াছিল, সে তাহার নূতন মনিবকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

কিন্তু মানুষ না ঠেকিয়া শিখে না, সে এ বাড়ীতে আসিবার কিছুদিন পরে, একদিন পুলিশ আসিয়া হাজির। চাটুয্যে বাবুরা মতির নামে চুরির অভিযোগ আনিয়াছেন। সে ছেলের গলার হার চুরি করিয়া পলাইয়াছে, এই অভিযোগ। সুচারু

বাড়ীতে ছিলেন না। পুলিশ মতিকে ডাকিয়া অনেক জেরা ও খানাতল্লাস করিল, তাহারা মতিকে থানায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সুচারুর একজন গোমস্তা জামিন হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া রাখিল। পরদিন আদালতে হাজির হইবে। সুচারু আশ্রিতা অনাথার জন্য সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া আদালতে হাজির হইলেন।

মোকদ্দমার ডাক হইলে, মুখুয্যে বাবুদের গোমস্তা প্রহ্লাদ সা-ই মতির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। মতি তাহার নিকট হার বিক্রয় করিয়াছিল, এই কথা সে কোর্টে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া অনর্গল বলিয়া গেল। সুচারু লোকটিকে বেশ লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার অর্থে নিযুক্ত কৌসুঁলীর জেরাতে মোকর্দ্দমা টিঁকিল না। মতি বাড়ী ফিরিয়া ভক্তিভরে সরলার পদধূলি লইল।

ইহার পরে ছয় মাস যাইতে না যাইতে, আবার প্রহ্লাদ সা আদালতের চাপরাসী লইয়া সুচারুর গৃহে আর্বিভূত হইল। সে মতির বিরুদ্ধে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লইয়াছিল। মতি তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যেন প্রহ্লাদ সা'র নিকট হইতে উচ্চ সুদে তিন শত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। সে টাকা সে না দিয়া পলায়ন করিয়াছে। দলিলে সর্ত্ত ছিল, অন্য উপায়ে আদায় না হইলে শরীরের দ্বারা টাকা আদায় করিয়া লওয়া যাইবে। অবশ্য ব্যাপারটি আগাগোড়াই কল্পিত। কিন্তু অর্থ ও কূটবুদ্ধির বলে প্রহ্লাদ সা অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইয়াছিল। সে চাটুয্যে

বাবুদের নিকট যেদিন সন্ধান পাইল যে সে কলিকাতায় রহিয়াছে, সেই দিন হইতে সে ফন্দি আঁটিয়া এই ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে।

এবারেও সুচারু তাহাকে বাঁচাইলেন। কিন্তু টাকা দিতে হইল। এতগুলি টাকা জলে গেল ভাবিয়া তিনি কিছু বিরক্ত যে না হইলেন, এমন নহে; কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

একদিন সুচারু কতকগুলি কাগজ উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার জিজ্ঞাসা কর ত মতির বাড়ীটা কোথায়?"

সরলা মতিকে আনিয়া হাজির করিলেন। মতি বলিল, "আমার বাড়ী কৃষ্ণনগরে, বাবা"।

"কৃষ্ণনগর—কৃষ্ণনগর, আচ্ছা সেখানকার সকলকে তুমি চেন?"

মতি বলিল, "না বাবা, আমি সেখানকার বউ; সকলকে কেমন করে চিনব?"

"আচ্ছা, রাধামাধব দাস কেউ ছিল?"

মতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিয়া কাঁপড়ের খুঁট খুঁটিতে লাগিল।

সরলা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার স্বামী?"

সুচারু চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তোমার স্বামী? রাধামাধব দাসের কথা বল্‌ছি—সে তোমার স্বামী?"

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা! তার কি হয়েছে?"

সেকথা লক্ষ্য না করিয়া সুচারু জিজ্ঞাসিলেন, "মতি, তোমার স্বামী বুঝি বরাবরই রুইনগরেই থাকতেন, না ?"

মতি বলিল, "না; তিনি গোয়াবাগানের এক তেল কলে চাকরী করতেন।"

"কোথায় ? তেল কলে ?"

"হাঁ, বাবা, তেল কলে। সে কলের নাম ছিল বাঙ্গাল অয়েল মিল।"

"বল কি ? তার পর ?"

"দুবছর হ'ল, তিনি এখানেই কলেরা হয়ে মারা যান।"

সুচারু কলমের অগ্রভাগ দংশন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আচ্ছা যাও।"

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, কি হয়েছে, বল না ?"

"সে পরে বল্‌ব এখন" বলিয়া সুচারু কাঁধে চাদর ফেলিয়া পদব্রজে বাহির হইয়া গেলেন।

মতি অনেক দিন দেশে যায় নাই। তাহার বড় ইচ্ছা করিত একবার দেশে গিয়া স্বামীর গৃহ দেখিয়া আসে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেকথা সে কোনও দিন বলিতে পারিত না। তাহার কারণ প্রথমতঃ প্রহ্লাদ সা'র ভীতি; দ্বিতীয় কারণ, সে তাহার মনিবের অনেক টাকা দণ্ড করিয়াছে। সরলার সস্নেহ ব্যবহারেও তাহার মন বাঁধা পড়িয়াছিল।

কিন্তু একদিন সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহার একজন প্রতিবেশী চিঠি লিখিয়াছে যে, মতির গৃহ-দাহ হইয়া

গিয়াছে ; সে প্রতিবেশীর গৃহও সেই সঙ্গে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। প্রহ্লাদ সা'র দ্বারাই যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, লেখক সে কথাও লিখিয়াছে এবং প্রহ্লাদ সা'র উদ্দেশে যথেষ্ট গালি বর্ষণ করিতেও ছাড়ে নাই। মতি গালি দিল না, কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়া গেল।

সরলা, তাহার স্বামী বাড়ীতে ফিরিলে, সেই চিঠিখানি তাঁহার হস্তে দিয়া মতির দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিলেন। সুচারু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিঠিখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন এবং মতিকে কাছে ডাকিয়া সে চিঠির লেখক সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। তারপর বলিলেন, "মেয়ে, এই লোকটাই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে। এই নফর দে-ই প্রহ্লাদ সা'র প্রধান সাক্ষী ছিল। এ-ই বলেছিল যে, তোমারই কথা অনুসারে সে দলিল লিখেছিল এবং টাকা তোমাকে দিতে দেখেছিল। যা হোক, ধর্ম্ম আছেন দেখ্‌ছি—তার ঘরও পুড়েছে!"

মতি বলিল "বাবা, আমি বাড়ী যাব।"

সুচারু বলিলেন, "বেশ কথা। গিয়ে কোথা থাকবে?"

"তা জানিনে!"

"আচ্ছা, তুমি যদি কিছু টাকা পাও, তবে কি করবে বলত?"

"আর আপনাদের অর্থদণ্ড করতে চাইনে, বাবা। যে ঋণ হয়েছে তা আর আমার জীবনে শোধ হবে না।"

"সে যাক্, যদি কিছু টাকা সেই কলে পাও—যে কলে তোমার স্বামী চাকরী করতেন!"

মতি ভাবিল, হয়ত বা তাহার স্বামীর মৃত্যুকালে কিছু মাহিয়ানা বাকী ছিল। সে সরলার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিল, "শ্বশুরের ভিটেটায় সন্ধ্যাদীপ দিবার কোনও উপায় যদি হয়, মা।" কথার শেষভাগে তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত ও বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

সে ব্যথা সরলার মনে বাজিল—তিনি বলিলেন,

"যেমন করেই হো'ক, তোর ভিটেয় আমি ঘর করে দেব।"

কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মতি বলিল,

"মা, তুমি মানুষ নও, দেবতা। কিন্তু আমার সে ভিটেও যে নাই। প্রহ্লাদ সা যখন চাপরাসী নিয়ে ধরতে এসেছিল, তখন ত সে স্পষ্ট বলে গিয়েছিল যে, সে আমার বাড়ী-ঘর সব বেচে নিয়েছে।"

সুচারু বলিলেন 'আচ্ছা সে আমি দেখে নেবো এখন। শোন মেয়ে, তেল-কলে তোমার কিছু টাকা আছে। রাধামাধবের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তেল-কলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। তখন সে কলের শেয়ার ২৫।৩০ টাকায় বিক্রী হয়েছিল, রাধামাধব সেই সময়ে কতকগুলি শেয়ার কিনে ফেলেছিল। কল্‌টা যে সময় ফেল্ হবার মত হয়, সেই সময়ে আমাদের কোম্পানী ঐ কল কিনে নিয়ে চালাতে আরম্ভ করে; এখন সে কলে অনেক লাভ হচ্চে। রাধামাধবের অংশগুলি সে বেচারী আর নিয়ে যেতে পারে নি; কোম্পানীর কাছেই মজুত আছে, তার সুদ ও মজুত হচ্চে, রাধামাধবের কোনও খোঁজ খবর

এত দিন পাওয়া যায় নি বলে'। আমি সে টাকা তোমাকে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছি।"

সরলা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কত টাকা হ'বে ?"

সুচারু মতিকে বলিলেন, "সে টাকা পেলে মেয়ে, তোকে আর চাকরী কর্‌তে হবে না! এখন, টাকা দিয়ে তোর কি কর্‌তে ইচ্ছা করে, তাই বল্।"

মতি বলিল, "আমার ঘরটুকু যাতে বজায় থাকে, তাই কর, বাবা। আর তোমাদের টাকা যাতে শোধ হয়!"

সুচারু বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। আমার এক বন্ধু আলিপুরের উকীল আছেন, আমি তাঁকে বলে দেব এখন, তোমার স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধার করবার জন্য এবং ওখানে যদি অন্য সম্পত্তি কিছু পাওয়া যায়, তবে তাও তোমার জন্য কিন্‌বার চেষ্টা কর্‌তে বলে দেব!"

সুচারু "বেঙ্গল ফ্লাওয়ার এণ্ড অয়েল মিল্‌স" কোম্পানীর একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর; তিনি এই সূত্রে রাধামাধবের কেনা শেয়ার সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া ঐ কোম্পানী অত্যন্ত লাভ করিতেছিল, এবং তাহার ফলে যে ১০০্ টাকার অংশ একদিন দুর্দ্দিনে ২৫।৩০ টাকায় বিকাইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মূল্য হইয়াছে হাজার টাকারও উপর, রাধামাধব তাহার সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন দিয়া ১৫ খানি অংশ কিনিয়াছিল। সুতরাং সেই অংশগুলি বিক্রয়

করিয়া ও তাহাতে লাভের অর্থ যোগদান করিয়া মতির প্রায় ১৭।১৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইল।

অল্পদিনের মধ্যেই স্থচারুর উপদেশমত দশ হাজার টাকায় রুইনগরের তালুক কিনিয়া ফেলা হইল। মুখুয্যে বাবুদের অবস্থা দ্রুত বেগে অবনতির দিকে যাইতেছিল, তাহাতে প্রহ্লাদ সা'র মত কর্ম্মচারী প্রাচীন সৌধে বটবৃক্ষের ন্যায় শিকড় গজাইয়া ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছিল। রাজস্বের দায়ে রুইনগর বিক্রয় হইয়া গেল।

মতি মুখুয্যে-বাবুদের তালুক কিনিয়াছে, এ সংবাদ যখন রুই নগর পৌঁছিল, তখন প্রহ্লাদের মস্তকের অবশিষ্ট চুলগুলি উঠিয়া গেল—ভাবনায়। মতির সহিত সে যে ব্যবহার করিয়াছে, এই বারে তাহার দেনা পাওনা চুকাইতে হইবে—এ চিন্তা তাহাকে কিছুতেই স্থির হইতে দিল না। শশী নাপিতানীও তাহাকে কোনও বুদ্ধি দিতে পারিল না। তখন অবশেষে প্রহ্লাদ সা একদিন হঠাৎ দীন বেশে স্থচারু বাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নানাবিধ শাক সব্জীর ভেট দিয়া মতির নিকট চাকরীর উমেদারী করিল। সে যে দুর্দ্দিনে অর্থ দিয়া মতির কত উপকার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেও ভুলিল না। পরিশেষে, একটি মুদ্রা মতির পায়ের কাছে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মতি শুধু হাসিল।

প্রহ্লাদ রুই নগরের মুচ্ছুদ্দি গিরিতে কায়েমী হইতে পারিল না। স্থচারুর উকীল বন্ধুটী রুই নগরে আসিয়া প্রমাণাদি সংগ্রহ

করিয়া প্রহ্লাদ সা'র বিরুদ্ধে জালের মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। প্রহ্লাদ সা'র জেল হইল, রুই নগরের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মতি অতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিল না; কিন্তু সে কি করিবে?

মতি তাহার স্বামীর ভিটা ফিরিয়া পাইল এবং সেখানে রাধামাধব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হইল।

শুকতারা

বিজয় ও বসন্ত দুটি বন্ধু; প্রবেশিকা পাশ করা অবধি তাহারা কলিকাতায় একসঙ্গে এক মেসে থাকে। বিজয় বয়সে কিছু বড়; সেই অধিকারে সে একটু মুরুব্বির চালে চলে। যখন কোনও কথা কহে, তখন একটু অনাবশ্যক জোর দিয়া জানাইয়া দেয় যে, বয়োজ্যেষ্ঠের যেটুকু প্রাপ্য, তাহা অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফলে; পরীক্ষায় গোটাকতক নম্বর বেশী পাইলেই যে সে অধিকার কেহ লোপ করিতে পারে এমন কোন কথা নাই। বসন্ত পরীক্ষায় বরাবর উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে; বিনয়ের ঝোঁকটা কিছু নিম্নের দিকেই বেশী। সে কোন প্রকারে দু'কুড়ি সাত বজায় রাখিয়া আসিতেছে, ইহাই তাহার মস্ত একটা গর্ব্বের বিষয় ছিল। এ বিষয়ে কথা হইলে সে বলিত, পরীক্ষাটা নেহাৎ একটা অপরিহার্য্য উৎপাত—একটা necessary evil বই আর কিছুই নয়; এর জন্ত যারা মাথা ব্যথা করে' মরে, তা'দের মত মূর্খ দুনিয়ায় নেই।" বসন্ত জীবনটাকে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; বিজয় সেটাকে অতি সহজ ও তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতেই চেষ্টা করিত।

বসন্ত বিজয়কে ডাকিত, "বিজয়দা, আজ ইন্‌ষ্টিটিউটে একটা ভাল লেক্‌চার আছে; ডাক্তার রায় প্রিজাইড্ করবেন, যাবে ত চল।"

বিজয় বলিত 'আরে রেখে দে, ও সব লেক্‌চারে ফেক্‌চারে গেলে আমার সর্দ্দি গর্ম্মি হবে। তার চেয়ে বরং চল্ এলফিন্‌ষ্টোনে ট্রে-অব হার্টস্ আছে, দেখে আসা যাক্।"

বসন্ত রিক্ত হইয়া ইন্‌ষ্টিটিউটে যাইত, বিজয় হাসিতে হাসিতে সিনেমা দেখিতে যাইত।

প্রথম প্রথম এক ঘরেই তাহাদের 'সিট' ছিল। বিজয় কতক-গুলি বিষয়ে তাহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিত। প্রথম, বসন্ত যে কেবল বসিয়া বসিয়া পড়িবে, ইহা বিজয় সহিতে পারিত না। তারপর বসন্ত একটু বাবু গোছের ছেলে ছিল, সব সময়ে সে ছিম ছাম ফিট ফাট হইয়া থাকিতে ভাল বাসিত। বিজয় সেদিকে সময়ের অপব্যয় করিতে চাহিত না। বসন্ত অতি যত্নে তাহার জুতা জামাটি গুছাইয়া রাখিত, বিছানা ঝাড়িয়া গুটাইয়া রাখিত এবং বইগুলি পড়া হইলে যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া দিত। বিজয় যেখানে সেখানে যখন তখন জিনিষপত্র কাগজ কলম ছড়াইয়া রাখিত। বসন্ত যখন তাহার কুঞ্চিত কেশে টেড়ি বাগাইয়া, রুমালে গন্ধ উড়াইয়া বেড়াইতে বাহির হইত, তখন বিজয় তাহাকে হাসি টিট্ কারীতে অস্থির করিয়া তুলিত। তাই এবার বসন্ত এক-সিট্ ওয়ালা একটি ঘর বাছিয়া লইয়াছে। বিজয় তাহাতে একটু মুখভার করিলে, সে বলিয়াছিল—

"কি জান ভাই, পরীক্ষার বছর; গল্পগুজবে সময় কাটালে আর চল্‌ছে না। একটু নিরিবিলি এ ক'টা মাস একটু পড়তে দেও।"

বিজয় ভাবিল বসন্ত ভাল ছেলে; হিষ্ট্রীতে ফ্রার্ষ্ট ক্লাস অনার পাবে—পড়ুক একলাই দিন কতক।

কিন্তু বসন্তের পড়াশুনার বাধা জন্মাইয়া দিল—একখানি সুন্দর মুখ। সে মুখখানি তার খুবই সুন্দর বোধ হইয়াছিল। শরতের রৌদ্র যখন আকাশে ভুবনে সদ্যধৌত পাতলা ময়ূরকণ্ঠী গরদের শাড়ীর মত আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে, তখন একদিন হঠাৎ জানালা খুলিয়া রাস্তার ওধারের বাড়ীর জানালায় একখানি বড় সুন্দর মুখ সে দেখিয়াছিল। আলুলায়িত কুণ্ডলা একটী কিশোরীর মূর্ত্তি তাহার নয়নপটে মোহের তুলিকা বুলাইয়া দিয়া গেল।

তারপরে দিনের মধ্যে শতবার সে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইত, এবং যতক্ষণ সে তরুণীর উদয় না হইত, ততক্ষণ হাঁ করিয়া সেই বাড়ীর দিকে তাকাইয়া থাকিত।

প্রথম যৌবনের আবেগে হৃদয় যখন দোদুল দুলিয়া নাচিয়া উঠে, তখন সে তাহারই উল্লাসে বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গের মত একবার উন্মুক্ত গগনের আস্বাদ পাইবার জন্য ছুটিয়া যায়; চারিদিকের স্বাধীন বাতাস তাহার শিরায় শিরায় যেন মদিরা ছুটাইয়া বহে। সে তখন লক্ষ্য ভুলিয়া, সকল ভুলিয়া দিগ্‌দিগন্তে আপনাকে প্রচারিত করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়ায়, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেনা, সম্মুখের ভাবনাও ভাবে না। সে আপন মনে উড়িয়া উড়িয়া

শুধু আপনাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। বসন্তেরও কতকটা সেইরূপ হইল ; সে আপনার ভার-কেন্দ্র স্থির রাখিয়া সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। উন্মেষিত যৌবনের সমস্ত পিপাসাপূর্ণ হৃদয় লইয়া সে একটি মুক্ত গবাক্ষের পার্শ্বে একখানি সুন্দর মুখের আশায় বড়ই উতলা হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইতে যাইবার জন্য বিজয় তাহাকে ডাকিতে আসিত। সিনেমার লোভ পরিত্যাগ করিয়া লেক্‌চার শুনিবার জন্যও সে প্রস্তুত হইত। কিন্তু নিষ্ফল! নানা ওজর করিয়া বসন্ত বাড়ীতে থাকিতেই ভালবাসিত। বিজয় হয় ত বলিত,—

"আচ্ছা তা'হলে আমিও না হয় আজ বেড়াতে না-ই গেলাম ; তুমি একটা গান গেয়ে যদি শোনাও।"

অন্য কোনও ঘর হইতে একটী হারমোনিয়ম ধার করিয়া আনা হইত। মেসের যে সব ছেলেরা বিকালে বেড়াইতে যায় নাই, তাহারা হারমোনিয়মের সুর শুনিয়া সেই ঘরে আসিয়া জড়ো হইত। বসন্ত মিহি সুরে গলা কাঁপাইয়া বিরহের গীত গাহিত। যাহার উদ্দেশে তাহার হৃদয় এই গানের সুরের আসন খানি পাতিয়া পূর্ব্ব রাগের অর্ঘ্য নিবেদন করিত, তাহার নিকট ইহা পহুঁছিত কিনা, সে জানিত না। তবে গান ভাঙ্গিয়া গেলে, সকলে যখন আপন আপন ঘরে ফিরিত, তখন তাহার সেই অন্ধকার ঘরের বাতায়ন তলে দাঁড়াইয়া সে দেখিত, আর একখানি অন্ধকার ঘরের জানালা উন্মুক্ত হইয়াছে এবং তাহার পশ্চাতে যেন সেই কিশোরী মূর্ত্তিটী বিরাজ করিতেছে!

কতদিন সে দেখিয়াছে রস্তার ওধারে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ও বাড়ীর মেয়েরা বেড়াইতে যাইতেছেন। বসন্ত কাপড় চাদরের পারিপাট্য বিধান করিয়া সে সময়ে বিনা প্রয়োজনেও বাহিরে যাইত এবং গাড়ী যখন তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত, তখন সে আরও নিকট হইতে তাহাকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। তাহার প্রেম নিবেদন যে একান্ত ব্যর্থ হইতেছে না, এই চিন্তা তাহাকে আনন্দে এত অধীর করিয়া তুলিত যে, সে ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইত না, ইহার পরিণাম কোথায়! একটা অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য উন্মাদনা তাহার মনকে লইয়া বড়ই নিষ্ঠুর খেলা খেলিতে লাগিল।

একদিন বিজয় তাহাকে বড়ই মুস্কিলে ফেলিল। বিকালে রোজ যেমন বিজয় বেড়াইতে যায়, তেমনি বেড়াইতে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এবং বসন্তকে জানালার কাছে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে একেবারে বলিয়া উঠিল—"বটে, এই তোমার এক্‌জামিনের পড়া তৈরি করা হচ্ছে? এরি জন্যে তুমি বেড়াতে যাবার অবসর পাও না, বটে? কি হে, বলি, 'লভে' পড়ে গেছ নাকি, ভায়া?"

বিজয় অপরাহ্নের অস্পষ্টালোকে দেখিল, রাস্তার অপর পারের জানালা হইতে একটি কিশোরী মূর্ত্তি সরিয়া গেল। বসন্ত লজ্জায় মরিয়া গেল; সে বিজয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও পারিল না। বিজয় তাহার স্কন্ধে প্রকাণ্ড এক চড় মারিয়া বলিল—"কি, একেবারে হুঁস নেই যে? এস, এস· এখন একটু

খানি বেড়াতে যাওয়া যাক্। এসব ভাল নয়, বলছি; ফের যদি এরকম বেয়াড়া চাল দেখতে পাই, একটা অনর্থ ঘটাব ব'লে রাখ্ছি।"

বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাবটা অন্য সময়ে হইলে বসন্ত তাহা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করিত। কিন্তু বসন্ত আজ তাহার লজ্জা ঢাকিবার এমন একটা সুবিধা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। তাই সে তখনি জামা চাদর ও জুতাটা পরিয়া লইল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে দুই বন্ধু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে যখন বায়োস্কোপ দেখিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল, তখন বিজয় অপরাহ্নের সমস্ত কথাই ভুলিয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার তিন চার দিন পরে, বিজয় একদিন বিকালে বসন্তের ঘরে আসিয়া টেবিল হইতে খবরের কাগজ টানিয়া লইয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল। বসন্ত এইমাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়াছে। সে জামা জুতাগুলি যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিল—"বিজয়দা, এবার পূজায় কি করা যায় বল ত?" বিজয় খবরের কাগজ হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল—"সটান বাড়ী যাওয়া যায়।"

"বাড়ী ত যাওয়া যায়; কিন্তু না গেলে বোধ হয় আরও ভাল হয়।"

"কারণ!"

"কারণ হচ্চে এই যে বাড়ীতে পড়াশুনাটা তেমন হয় না।"

"ঢের হয় ! মেসে একলা এই সারা ছুটিটা কাটিয়ে দেওয়া—এ কল্পনাই করা যেতে পারে না। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি থাকৃতে পার, কিন্তু বায়ু ভক্ষণ করে' থাকৃতে হবে, জেনো।"

"কেন ?"

"মেস বন্ধ হ'য়ে যাবে। ঠাকুর চাকর কেউ থাকৃবে না।"

"সে ত তোমার হাত। তুমি ত ইচ্ছে করলেই এ সব বন্দোবস্ত করতে পার।"

বিজয় মেসের ম্যানেজার। সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "পারি—কিন্তু করবো না। ঠাকুর চাকর পূজার ছুটীতে দিন কতক একটু জিরিয়ে নেবে—এথেকে আমি তাদের বঞ্চিত করতে পারবো না।"

বসন্ত একটু আবদারের স্বরে বলিল, "আর বছর ত পেরেছিলে।"

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই এ বছর আর বেচারিদের কষ্ট দিতে চাইনে।"

বলিয়া বিজয় খবরের কাগজের পাতা উলটাইয়া মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল। বসন্ত বুঝিল, বিজয় তাহার সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে নড়ানো সহজ নহে।

কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ বিজয় বলিয়া উঠিল—"ওহে বসন, কার্ত্তিক বোসের ছেলে অনিল যে আমাদের সঙ্গে পড়ে।"

"কার্ত্তিক বোসটা আবার কে ?"

"বাড়ীটাই চেনো, তার স্বত্বাধিকারীর কোনও খবর রাখ

না ?"—বলিয়া বিজয় রাস্তার ওপারের বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

"ওঃ।"

"এবং কার্ত্তিক বোসের একটি বিবাহ যোগ্য কন্যা আছে, সে খবরটিও আমি অনিলের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তোমার জন্য, বুঝলে ?"

"হুঁ"—বলিয়া বসন্ত নীরব হইল।

২

পূজার ছুটী হইয়া গিয়াছে। বিজয়-বসন্তের মেস সমস্ত জানলা খড়খড়ি বন্ধ করিয়া মাস খানেকের জন্য গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল। বিজয় দেশে পূজার উৎসব উপভোগ করিতেছে। বসন্ত বেচারী দিন কতকের জন্য বাড়ী গিয়াছিল বটে, কিন্তু যে দুষ্ট অদৃষ্ট-দেবতা মানুষের প্রাণ লইয়া ক্রূর ক্রীড়া করিতে ভাল বাসেন, তিনি তাহাকে সোয়াস্তি দিলেন না। সে একদিন পুঁথিপত্র বাঁধিয়া কাপড় জামা ট্রাঙ্কে পূরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। সে এবার সত্য সত্যই সঙ্কল্প আঁটিয়া আসিল—কলিকাতায় গিয়া ভাল করিয়া পড়িবে, এগ্‌জামিনে তাহাকে ভাল ফল করিতেই হইবে।

পটলডাঙ্গায় তাহার একটি বন্ধু ডাক্তারী পড়িত; মেডিকেল কলেজের সেই মেসে আসিয়া সে আপাততঃ উঠিল এবং "ফ্রেণ্ড চার্জ্জ" দিয়া বন্ধুর সঙ্গেই রহিল। দিন কুড়ি বাদে

তাহাদের শিমলার মেস খুলিলে তখন আবার সেখানে গিয়াই জুটিবে।

সে প্রথম খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল। তাহার বন্ধু প্রায় সারা দিনরাত কলেজে ও হাঁসপাতালে কাটাইয়া দেয়; সেও নির্জ্জনে তাহার বই ও খাতাগুলি বাহির করিয়া বেশ পড়ে, মুহূর্ত্তের জন্যও মনে অন্য চিন্তা আসিবার অবকাশ দেয় না। কিন্তু দুষ্ট ছেলে যেমন গুরুমহাশয়ের সতর্ক শাসন এড়াইয়া পাঠশালা হইতে পলায়ন করে, তেমনই তাহার মন সঙ্কল্পের বাঁধ লঙ্ঘন করিয়া উধাও হইয়া কোথায় ছুটিত! সমস্ত দিনটা সে কোনরূপে কাটাইয়া দিত। চারিটা বাজিতেই তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিত, এবং তাহার পদযুগল যেন কিসের টানে শিমলার দিকে তাহাকে বহিয়া লইয়া যাইত। শত সঙ্কল্পের রশ্মি দিয়াও সে তাহাদের গতি ফিরাইতে পারিত না। প্রথম প্রথম দুই একদিন গিয়া সে দেখিল তাহাদের মেস বাড়ীর দরজাগুলি বন্ধ, সম্মুখের বাড়ীর জানালাও রুদ্ধ; এক আধ দিন খোলা থাকিলেও তাহার পার্শ্বে কোনও তরুণী আসিয়া ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইত না।

একদিন বসন্ত যখন পদচারণা করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া তাহাদের মেসের রোয়াকে বসিয়া পড়িয়াছে, তখন অতি ধীরে ধীরে, যেন কত সংকোচ ও ভয়ের সহিত, খড়খড়িগুলি তুলিয়া আবার কে বন্ধ করিয়া দিল। তার পরক্ষণেই জানলা খুলিয়া গেল এবং বসন্তের অভীপ্সিত মূর্ত্তি যেন যবনিকার অন্তরাল

হইতে আবিষ্কৃত হইল। তাহার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি ; তাহার লীলা-চঞ্চলতা বসন্তকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহারও প্রাণ এতদিন পিপাসিত হইয়া রহিয়াছে।

ইহার পরদিন হইতে প্রতিদিন বিকালে সে রাস্তায় বিনা প্রয়োজনে বসন্ত কতবার যাতায়াত করিত এবং প্রতিদিনই জানলা হইতে দুইটি একান্ত বিচ্ছেদবিধুর চক্ষুর সতৃষ্ণ দৃষ্টি ভিড়ের ভিতর হইতে তাহার চক্ষুর সন্ধান করিয়া লইত। ইহাদের দৃষ্টি বিনিময়ের ভিতর কোনওরূপ ইঙ্গিত, সঙ্কেত বা পরিচয়ের আভাস ছিল না। তবুও প্রতিদিন এই চারিটি চক্ষু অন্ততঃ একবার মিলনসুখে বিভোর হইয়া, দুইটি প্রাণীর হৃদয়ের কথা কি এক ইন্দ্রজালে পরস্পরকে নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিত, তাহা তাহারাই জানে!

পূজার ছুটি ফুরাইয়াছে ; ছেলের দল বাক্স বিছানা লইয়া শূন্য মেসের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীওয়ালার পাঁড়ে দরওয়ান পৈতার প্রান্তলগ্ন চাবিগুচ্ছের একটি বাহির করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। শূন্য বাড়ী মুহূর্ত্তের মধ্যে কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। বিজয় ঠাকুর-চাকরকে খবর দিতে গেল ; ব[illegible]পাশের দোকানে লুচি ভাজিতে বলিয়া চোরবাগানে চপ্ কাট্‌লেট্ কিনিতে গেল। মেসে উৎসব পড়িয়া গেল ; কেহ গানের ছলে চীৎকার করিয়া অন্য ছাত্রের নিকট ধমক খাইল ; কেহ সেই গানের তাল দিতে গিয়া তক্তপোষের ধূলা উড়াইয়া ঘরময় করিল।

পরদিন হইতে কলেজ খুলিল ; মেসের উৎসাহ-উৎসবও কমিয়া আসিল। বসন্ত কলেজে গেল বটে, কিন্তু মন তিষ্টিল না। অধ্যাপকেরা যথারীতি পড়াইয়া গেলেন, ঘুমন্ত মানুষের মত বসন্ত—তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না। সে হতাশ হইয়া এক ঘণ্টা পরেই চলিয়া আসিল এবং বইগুলি বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জানালার ধারে গিয়া এক দৃষ্টিতে রাস্তার পর-পারের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে সিটি কলেজে পড়িত ; কাজেই বিজয় বুঝিতে পারিত না যে, বসন্ত এমনি করিয়া পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্ত্তে একখানি সুন্দর মুখের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর বসন্ত বিকালের দিকে বড় ও-বাড়ীর দিকে চাহিয়া থাকে না। বেড়াইতে যাইতে বলিলেও বসন্ত আর আপত্তি জানায় না। তবে প্রায়ই বিজয় যে দিকে যায়, সে দিকে সে যাইতে চাহিত না। বিজয়ও সেটা সহজেই উপেক্ষা করিত ; কারণ বিজয় জানিত, খেলা ঘোড়-দৌড় বা বায়স্কোপের দিকে বসন্তের আদবে 'টেষ্ট' নাই। সুতরাং সে যখন অন্যদিকে যাইতে চাহিত, [illegible] তাহাতে বাধা দিত না। ক্রমেই সে বসন্তের প্রণয়ঘটিত র[illegible]ল। বসন্ত যে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া বাহিরে [illegible] পরেই ফিরিয়া আসে, তাহা সে সন্দেহ করিতেও পারে নাই।

বসন্তকে বিজয় ভালবাসিত ; সে যে ভাল ছেলে এজন্য তাহার মনে ঈর্ষা আসিত না। সে নিজে পরীক্ষায় খুব ভাল পাশ না করিতে পারিলেও বসন্তের গৌরবে সে উৎফুল্ল হইত। বোধ হয়

সেইজন্যই সে তাহার প্রতি একটু কর্তৃত্বের দাবী রাখিতে পারিলেই তৃপ্তিলাভ করিত। বসন্ত গান, গাহিত, বিজয় তাহা আদর করিয়া শুনিত—তেমন করিয়া আর কেহ শুনিত না। বসন্ত ইতিমধ্যে কোনও মতে মিল জুটাইয়া একটা কবিতা রচনা করিয়াছে; বিজয় হঠাৎ আসিয়া সেটি কাড়িয়া লইয়া দেখিয়াছে এবং অজস্র প্রশংসাবাক্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে! গান কি কবিতা এর কোনটিই বিজয়ের আসিত না; তাই সে ইহার অভিব্যক্তি বসন্তের ভিতর দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত!

কিন্তু তাহাদের এমন বন্ধুত্বেও বিচ্ছেদ ঘটিল। একদিন সকালে বিজয় একখানি চিঠি হাতে করিয়া বসন্তের ঘরে হুড়মুড় করিয়া ঢুকিল। দরজাটি ভেজানো ছিল; একটু শব্দ হইতেই বসন্ত একখানি বই শেল্‌ফ হইতে টানিয়া লইয়া পড়িবার ভান করিল; বিজয় সে সব কিছুই লক্ষ্য করিল না। সে একেবারে বসন্তের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে বেশ করিয়া ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিল—"ওরে বসা, আমার বিয়ে যে রে!"

বসন্তও তাহার হাসিতে যোগদান করিল এবং চিঠি খানি বিজয়ের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বিজয় তাহাকে উল্লাসে আনন্দে এতই বিব্রত করিয়া তুলিল যে, সে চিঠিখানি হাতে করিয়াই রাখিল, পড়িবার সুযোগ পাইল না।

বিজয় বলিল—"বাবা পূজার ছুটিতে নিজে কলকাতায় এসে

মেয়ে দেখে গেছেন, ওরা অগ্রহায়ণ গায়ে হলুদ এবং ৫ই সুতহিবুক যোগে বিবাহ।"

বসন্ত বলিল—"বাঃ রে—সে ত এই আসছে শুক্রবার—গায়ে হলুদ এখানে হবে ত? তা হলে ঐ জটাব্যাটা এক বালতী হলুদ পিষে দেবে, আর আমরা উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, তোমাকে হলদে পাখী বানিয়ে ছাড়বো।"

বিজয় হলদে পাখী সাজিবার সম্ভাবনায় আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। তার পরেই একটু থামিয়া বলিল—"সে বোধ হয় হবে না—মা ওঁরা সম্ভবতঃ আসছেন। বাড়ী ভাড়া করতে লোক আসছে; বোধ হয়, বিকেলেই এসে পড়বে।"

বসন্ত বলিল—"তা হলই বা; আমরা বুঝি চুপ করে থাকব? কনে দেখ্‌তে পেলুম না, আবার গায়ে হলুদটাও ফাঁকিতে ফেলতে চাও, বেশ লোক যা হোক তুমি।"

ইহাদের আনন্দ কোলাহল শুনিয়া অপর ঘরের নলিনী, পরেশ ও সুধা আসিয়া জুটিল। তাহারা বিবাহের গন্ধ পাইয়া মিষ্টান্নের জন্য নাচিয়া উঠিল। বসন্তের সঙ্গে তাহারাও সকলে 'কনে' দেখার সুযোগ না পাওয়ার জন্য যথেষ্ট অনুযোগ করিল। 'কনে' দেখিতে কেমন? বয়স কত? নাম কি? লেখাপড়া জানে কি না ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিয়া বিজয়কে তাহারা বিব্রত করিয়া তুলিল।

বিজয় বলিল, "তোদের অত কথার জবাব দেওয়া একজন লোকের পক্ষে অসম্ভব। আগামী ৫ই অগ্রহায়ণ তিয়াত্তরের

দুই নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন। সত্বর অর্দ্ধআনা টিকিট সহ আবেদন করুন।"

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, হাসিল না কেবল বসন্ত। তাহার মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহাদের সাম্‌নের বাড়ীর নম্বর যে ৭৩।২, এ সংবাদ সে রাখিত। সুতরাং বিজয়ের সহিত যে কার্ত্তিক বাবুর কন্যার বিবাহ হইবে, একথা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। বিজয় ও কথাটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিল—"ওহে কার্ত্তিক বাবুর ছেলে আমাদের কলেজের অনিলই এই সম্বন্ধ করেছে, বুঝলে!"

বসন্তের আকস্মিক পরিবর্ত্তন বিজয়ের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহার আনন্দোচ্ছ্বাসও কমিয়া গেল। ছাত্রেরাও কলেজের সময় হইল বলিয়া একে একে চলিয়া গেল।

"বসন্ত, তুমি হঠাৎ বিমর্ষ হলে যে?"

"না, বিমর্ষ আর কি?"

"তোমায় সত্যি বলছি বসন্ত, এ বিবাহে আমার কোনই হাত নেই। সেদিন অনিলকে কথায় কথায় তার বোনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন করেছিলাম সেটা তুমি জান—তাতেই বোধ হয় সে মনে করলে আমি একজন "ক্যাণ্ডিডেট্।" তারপর সে একটু একটু করে আমার ঠিকানা, বাবার নাম ইত্যাদি জেনে নিয়েছিল, একদিন বলেওছিল—এখন মনে পড়ছে—যে আমার বাবাকে তার বাবা জানেন। কার্ত্তিকবাবু সেক্রেট্যারিয়েটে চাকুরী করেন কিনা, বাবা ডেপুটী হবার সময় পরিচয় হয়েছিল।"

বসন্ত একটু হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বিজয়কে বলিল, "আমার হঠাৎ ভয়ানক মাথা ব্যথা করছে, বোধ হয় জর হবে।" এই বলিয়া জর আসিবার ভাবটা অভিনয় করিয়া দেখাইল।

বিজয়ও কতকটা তাহাই বুঝিল। অন্য কারণ কিছু যে থাকিতে পারে, তাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইল না। বসন্ত একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিলেও হইতে পারে! কিন্তু কেন? সে কার্ত্তিক বাবুর মেয়েটিকে জানালা, দিয়া দেখিয়াছে? সেত একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে—অমন ছেলে মানুষি করিবার বা তাহাতে প্রশ্রয় দিবার মত বয়স ত তাহাদের নয়। তাহারা বড় হইয়াছে, এখন দায়িত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছে। যাহাকে বিবাহ করিবে না, এমন একটি অবিবাহিত কন্যার দিকে তাকাইয়া থাকা কোন ভদ্রলোকেরই উচিত নহে। বসন্ত লেখাপড়া শেষ না করিলে, তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না; অথচ কার্ত্তিকবাবুর কন্যা বয়স্কা। এমন অবস্থায় তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাবে আপত্তির কি থাকিতে পারে? এইরূপ একটা চিন্তার ধারা বিজয়ের মনের মধ্য দিয়া দ্রুত বহিয়া গেল।

বসন্তকে কিছু আহার করিতে নিষেধ করিয়া, বিজয় কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেল। বসন্তও দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

৩

বিজয়ের বিবাহ হইয়া গেল। বসন্তই কেবল সে বিবাহে গেল না। সে গায়ে হলুদের আগের দিন হঠাৎ বিছানা পত্র

বাঁধিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না। বিজয় ইহাতে অবশ্য অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিল। তাহার দুঃখের কারণ যে, বসন্ত তাহাকে একটি কথাও না বলিয়া চলিয়া গেল। দুঃখের সময় বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি না পাইলেও তাহাতে মনে তেমন ক্ষোভ হয় না। কেন না দুঃখ দেখিলে পথের মানুষও একটু দাঁড়াইয়া সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া যায় না; কিন্তু সুখের সময়, উৎসবের দিনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর অভাবে হৃদয়ে যে আঘাত লাগে তাহাতে যেন উৎসবের সমস্ত আনন্দ ম্লান হইয়া উঠে। বসন্তের অভাবে বিজয়ের প্রাণটা বড় আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া উঠিল। সে তাহাকে কিছু না বলিয়া কহিয়া চলিয়া গিয়াছে, এজন্য অভিমানও হইল। বিজয় ত জানিত না, কি দুঃসহ বেদনা লইয়া বসন্ত চলিয়া গিয়াছে!

বসন্তও ব্যর্থ ক্ষোভের নিষ্পেষণে জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়ের উপর তাহার যে খুব রাগ হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। কারণ বিজয়ের ত কোনও দোষ ছিল না। তাহার প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার সে কোন দিন বিজয়কে বলিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই। কারণ সে জানিত যে বিজয় কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না, এমনই একটা গর্হিত কাজ সে করিয়া ফেলিয়াছে।

কর্ত্তিক বাবুর কন্যা আর দু'দিন বাদেই বিজয়ের হইবে, এ চিন্তায় তাহার সমস্ত হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। প্রথমেই সে তাহার উপর রাগ করিল; ঘরের জানালা দৃঢ় ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়া

শয্যার আশ্রয় লইল। কিন্তু ঘরের জানালা বন্ধ করা যত সহজ, বিধাতার নিয়মে হৃদয়ের জানালা বন্ধ করা তত সহজ নহে। তাহার হৃদয় শতবার যেন সেই বিরহ-কাতর চক্ষু দুইটির অন্বেষণে ধাবিত হইল। আর সে অবলা বালিকারই বা দোষ কি? হিন্দুসমাজের বিবাহে কন্যার স্বাধীনতা কোথায়? পিতা যাহার করে অর্পণ করিবেন, তাহারই গলদেশ মাল্য এবং বাহুযুগে বেষ্টন করিতে হইবে,—এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বিরুদ্ধে একজন সামান্য বালিকা কি সাহসে দাঁড়াইবে?

বসন্ত তাহার নিজের অপরাধ সম্বন্ধেও অন্ধ ছিল না। সে কেন এমন করিয়া সে বালিকাকে প্রলুব্ধ করিয়া এতদূর টানিয়া আনিল? তাহারই ত যত দোষ। যদি এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, তবে কেনই বা সে বিবাহের জন্য চেষ্টা করিল না? বিজয় কোনও কোনও বিষয়ে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু আগে হইতে চেষ্টা করিলে হয় ত তাহারই সহিত এ বিবাহ হইতে পারিত। বিজয়ের পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বসন্তের পিতা পল্লীগ্রামের জমিদার। বিজয়ের পিতা বিনা পণে পুত্রের বিবাহ দিতে প্রস্তুত, তাহার পিতা হয়ত পাঁচ সাত হাজার চাহিয়া বসিতেন। তাহা হইলেও চেষ্টা করিয়া দেখা যাইত! সে চেষ্টা সে করিল না কেন? এখন সব বিফল; তাহার চোখে জল আসিল।

এই সকল চিন্তায় বসন্তের মন অস্থির করিয়া তুলিল এবং সে সকলের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। নিষ্ফল ক্রোধের নির্য্যাতনে বিড়ম্বিত হইয়া সে অবশেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

বাড়ীতে গিয়া সে তাহার পিতাকে বলিল যে তাহার মাথার অসুখ হইয়াছে, সে আর কিছুতেই পড়িতে পারিতেছে না। কথাটা যে একেবারেই মিথ্যা, তাহা নহে। চিন্তায় চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। তাহার চোখ বসিয়া গিয়াছিল, ললাটের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল এবং সমস্ত মুখমণ্ডল এমন পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল যে তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার পিতা ও মাতা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ মনে করিলেন, বিশ্রাম ও শুশ্রূষার গুণে তাহাকে শীঘ্রই ভাল করিয়া তুলিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। বসন্ত ক্রমশঃ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কিছুদিন পরেই কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

চোরবাগানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, বসন্তের পিতা রামকমল বাবু পুত্রের চিকিৎসার জন্য সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিজয় এতদিন বসন্তের কোনও খোঁজই লয় নাই—অভিমান করিয়াই সে সংবাদ লইতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু যখন শুনিল যে বসন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়া রহিয়াছে, তখন সে তাহাকে দেখিতে ছুটিয়া গেল।

বসন্ত তাহাকে দেখিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল; কিন্তু পরক্ষণেই মাথার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া শুইয়া পড়িল। বিজয় অনেকক্ষণ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল।

প্রতিদিন সে কলেজ হইতে চোরবাগানের বাসায় যায় এবং অনেকক্ষণ কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে। রামকমলবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া সে ডাক্তার করকে আনিয়া হাজির করিল। বিজয়ের আগ্রহ দেখিয়াই ডাক্তার কর বসন্তকে অত্যন্ত যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার কর বিজয়ের শ্বশুরের বন্ধু। তাঁহার চিকিৎসার গুণে বসন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল এবং একটু আধটু বেড়াইতে বাহির হইল।

একদিন সে তাহাদের মেসে গিয়া পড়িল, তখনও বিজয় কলেজ হইতে আসে নাই। মেসে তখন প্রায় কেহই ছিল না। বসন্ত একবার তাহার ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে গেল এবং পূর্ব্বের অভ্যাসমত জানালাটি কম্পিত হস্তে খুলিয়া ফেলিল। রাস্তার অপর পারের বাড়ীর জানালাটিও বন্ধ ছিল। বসন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া সেই জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে জানালা আজ খুলিল না এবং কেহই আজ আর সে জানালার পাশে দাঁড়াইল না। বসন্ত ভাবিল, আজ সে পরের বধূ ; রুদ্ধ জানালা তাহারই অবরোধের প্রথম নিদর্শন।

বিজয় আসিল ; হঠাৎ বসন্তের ঘর খোলা দেখিয়া, সে সেইদিকে আসিয়া দেখিল বসন্ত মুক্ত বাতায়নের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। বিজয়ের আগমন সে বুঝিতে পারে নাই। বিজয় ধীরে ধীরে গিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল।

আজ বসন্ত তাহার চোখ জানালা হইতে ফিরাইয়া লইল না। বিজয়ের সহানুভূতি তাহাকে স্পর্শ করিল এবং যখন সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিজয়ের দিকে ফিরিল, তখন তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল। দুঃখের অনলে পুড়িয়া তাহার লজ্জা ভস্মীভূত হইয়াছিল। সে আজ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিজয়কে বলিল "বিজয় দা, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও।"

বিজয় বুঝিল, 'তোমরা' বলিতে সে আর কাহার কথা বলিতেছে। সে বসন্তের হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "এতদিন পরে, তবু ভাল—"

বসন্ত একটু সামলাইয়া বলিল, "এতদিন পরে নয়, ঐটি তুমি ভুল বুঝেছ। আমি তোমার বিবাহে উপস্থিত না থাকৃতে পারলেও, তোমাদের মঙ্গল কামনাই করেছি এটা বিশ্বাস কোরো।"

"আচ্ছা তা যেন হলো, বসন্; একটা বিষয় এখনও আমার মনে খট্‌কা লেগে আছে; তুই আমায় না বলে' চলে গেলি কেন? এটা কি তোমার উচিত হয়েছে, বল্‌তে চাও?"

বসন্ত একটু মিথ্যা বলিল; সে বিজয়ের দিক হইতে চক্ষু নামাইয়া বলিল, "উচিত কি অনুচিত তা জানিনে বিজয় দা। তবে তোমাদের উৎসবের মধ্যে আমার মাথার ব্যামো নিয়ে তোমাকে জ্বালাতন করে তুল্‌তে, আমার বিশেষ আগ্রহ হ'বার কোনও কারণ ছিল না।"

বিজয়ের খট্‌কা দূর হইল; তবুও সে অনুযোগের স্বরে

বলিল, "আমার বিবাহের উৎসবটা এমন ক'রে মাটি ক'রে দেওয়ার চেয়ে সেটা যে মন্দ হ'ত, তা আমার মনে হয় না।"

বসন্ত জানিত যে বিজয়ের এই দৈন্যের মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। অনেক দিন পরে বিজয়ও বসন্তকে আবার তেমনই বন্ধুত্বের পদে বরণ করিয়া লইল; তাহাদের মাঝখানে যে ব্যবধান ছিল তাহা খসিয়া পড়িয়া গেল।

বিজয় অতি আগ্রহের সহিতই তাহাকে বলিল, "বসা, আজ চল্‌না তোর বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল; বিজয় দেখিতে পাইল না যে বসন্ত তাহার প্রস্তাবে চমকিয়া উঠিল।

"আর একদিন হবে বিজয় দা; আজ মাথাটা বড় ক্লান্ত বোধ হচ্চে।"

বিজয় ইহার পর আর কথা বলিতে পারিল না; কিন্তু একটু বিমর্ষ হইল।

সন্ধ্যার পর যখন বসন্তকে পৌঁছাইয়া দিয়া বিজয় মেসে ফিরিতেছিল, তখন হঠাৎ রাস্তায় রামকমল বাবুর সহিত তাহার দেখা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কাল ওকে কেমন দেখ্‌ছো, বাবাজি?"

বিজয় হাসিয়া বলিল, "ভালই ত; আপনি কেমন বোধ করেন?"

"আমি ত মন্দ বুঝছি না; ভাবচি এখন কোথাও ওকে

পাঠাতে হবে। দেখ, একটা মজার কথা আছে বাবাজি; ডাক্তার কর আমায় কাল বল্‌ছিলেন যে ওর একটা বিবাহ দিলে মন্দ হয় না।"

বলিয়া রামকমল বাবু হাসিতে লাগিলেন।

বিজয় উৎসাহের সহিত বলিল, "তা হলে' ত বেশ হয়, আমি কাল থেকে মেয়ে খুঁজতে লেগে যাব। অনেক ঘটক আমার কাছে আসে; মুখের কথা বল্‌লে তারা এমন দু'শো মেয়ের খোঁজ এনে দেবে এখন।"

রামকমল বাবু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ছেলেকে আজ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে ত একেবারে নারাজ, বাপু। দেখ যদি তাকে বলে কয়ে রাজি করতে পার, ত আমার অমত নেই।"

"সে আমি দেখে নেবো; আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ডাক্তার কর যখন বলেছেন যে বিয়ে দেওয়া দরকার, তখন বিয়েটা যেমন করে' হোক্ দিতেই হ'বে। নয়ত অসুখ ভাল হ'বে না যে।"

রামকমল বাবু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন হইতে বিজয় বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। বসন্ত প্রথম প্রথম সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; তার পর যখন দেখিল যে বিজয় তাহার জেদ কিছুতেই ছাড়ে না, তখন সে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

একদিন বিজয় তাহাকে মেসে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিজয়ের ঘরে বসিয়া দু'জনে গল্প করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বিজয় সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল এবং নিজের চেয়ারখানি তাঁহাকে দিয়া খাতা পুঁথি ঠেলিয়া তক্তপোষে আপনার জন্য একটু স্থান করিয়া লইল। ভদ্রলোক একবার সে ঘরের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া লইলেন, তাহার পর পকেট হইতে চুরুটের বাক্স ও দেয়াশলাই বাহির করিয়া চুরুট ধরাইলেন।

বিজয় বসন্তের পরিচয় দিল; বসন্তের কানে কানে বলিল, "আমার শ্বশুরের ভগ্নীপতি।" বসন্ত উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; তিনি বলিলেন "বসো বাবা, বসো।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি বসন্তকে দেখিলেন; তারপর বলিলেন, "তোমার শুনছি, বাবা, বিবাহে বড় আপত্তি?"

প্রথম পরিচয়ে একজন ভদ্রলোককে এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা পাড়িতে দেখিয়া বসন্ত কিছু বিরক্ত হইল। সে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

আগন্তুক বলিলেন "শোন বাবা, আমি আসছি মেদিনীপুর থেকে মেয়ের বিয়ের চেষ্টায়। জানইত, বাবা, আজকাল মেয়ের বিয়ে কি ব্যাপার! বিজয় বাবুর কাছে তোমার কথা শুনে বড় আশা হয়েছিল; মনে করলাম, তোমার বাবার হাতে পায়ে ধরে' কাজটা ঠিক করে' ফেলতে পারব। কিন্তু কাল তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে' যা শুনলুম, তাতে নিরাশ হয়ে পড়েছি। তিনি

বল্‌লেন 'ছেলের মত নেই।' বিজয়ও বল্‌লেন আমরা হার মেনেছি মশায়।"

আগন্তুক থামিলেন; বসন্ত মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আমার শরীর অসুস্থ, হয়ত এ বছর আমার পরীক্ষা দেওয়াই হবে না; এখন অন্য কথা ভাববার সময় নেই।"

"কিন্তু বাবা বুঝে দেখ, তোমার যখন ভাববার সময় হবে, তখন যে আমার বড় অসময় হয়ে পড়বে। আমার মেয়েটি বড় হয়েছে, আর ত রাখতে পারিনে।"

বসন্ত মনে মনে বলিল, তার আর আমি কি করতে পারি? কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

তিনি আবার বলিলেন "আমি তোমায় কিছু জোর করে' ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিতে পারিনে। তবে আমার বড় আকিঞ্চন যে তোমার মত সৎপাত্রে মেয়েটিকে দিতে পারি, বাবা। তুমি অগত্যা মেয়েটিকে দেখ; মেদিনীপুর যেতে না চাও, এখানে এনে দেখাতে পারি। পছন্দ না হয়, তখন যা' ইচ্ছে বল্‌তে পার—মেয়েটি আমার বড় ভাল। যেমন দেখ্‌তে, তেমনি কাজে কর্ম্মে।"

মেয়ের বর্ণনায় বসন্তের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। সে এই প্রসঙ্গ কোনও মতে চাপা দিবার জন্য বলিল, "আচ্ছা আমি ভেবে দেখি; বিজয়দাকে দিয়ে আপনাকে জানাব!"

ভদ্রলোক একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিদায় লইলেন।

৪

বসন্ত পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া গত দুই মাসকাল বারাণসীধামে বাস করিতেছে। সেখানকার চিরপ্রসিদ্ধ কোলাহলময়ী শান্তি তাহার হৃদয়ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইয়া দিল। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দিরে যখন লোক ধরে না, তখনও সেই জনতার মধ্যে সে অপূর্ব্ব বিজনতার শান্তি বোধ করিত। সায়ংসন্ধ্যায় যখন গঙ্গার কলতান ডুবাইয়া দিয়া সহস্র ঘণ্টায় বিশ্বদেবের আরতি বাজিয়া উঠিত, তখনও সে দশাশ্বমেধের ঘাটে আপনার সুখ দুঃখের স্মৃতি লইয়া একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। বাহিরের বিশ্ব তাহাকে সে সমাধি হইতে বিযুক্ত করিতে পারিত না। এমনই ভাবে সে তাহার সেই সুখের দিন কয়েকটির মধুর স্মৃতি বহিয়া বহিয়া কাটাইয়া দিল। তাহার দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বিশ্রাম ও অবসর সেই দুইটি চক্ষুর বিষাদভরা দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

ক্রমে যখন তাহার মন একটু স্থির হইয়া আসিল, তখন আর বারাণসী ভাল লাগিল না। গঙ্গার ধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িত। শেষে একদিন সে এলাহাবাদ যাইবার জন্য ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিল। মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল করিতে হয়। সকল যাত্রীতে মিলিয়া ষ্টেশনে মহা কলরব তুলিয়াছে, এখন কলিকাতার যাত্রী গাড়ীও আসিবে। যাহারা কলিকাতার অভিমুখে যাইবে,

তাঁহারা টিকিট কিনিয়া গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আপ্ ট্রেণের কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল।

বসন্ত প্ল্যাট্ফরমে পায়চারী করিতে ছিল। কলিকাতার গাড়ী আসিয়া চলিয়া গেল। আপ্ ট্রেণও আসিল, গাড়ী অনেকক্ষণ থামিবে। সুতরাং বসন্ত গাড়ীতে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইল না। একজন আরোহী মধ্যম শ্রেণীর একখানি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া 'চাবিওয়ালা, চাবিওয়ালা' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। স্বরটি বসন্তের বিশেষ পরিচিত; সে সেদিকে চাহিবামাত্র বুঝিল, বিজয়। বিদেশে অকস্মাৎ পরিচিতের দর্শন পাইলে যে পুলকে আত্মহারা করিয়া ফেলে, বসন্ত সেই পুলকের বশীভূত হইয়া তাহার দিকে ছুটিল। চাবিওয়ালা চাবি খুলিয়া দিল; বিজয় প্ল্যাটফরমে নামিয়া বসন্তকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিল। তাহার চেহারা একটু ভাল হইয়াছে দেখিয়া, বিজয় আনন্দ প্রকাশ করিল। বিজয় জানিত যে, বসন্ত বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কাশীতে আসিয়াছে, সুতরাং সে বসন্তকে সেখানে দেখিয়া বিস্মিত হইল না। বিজয়কে দেখিয়া বসন্ত বরঞ্চ বিস্মিত হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "পরীক্ষা দিচ্চ না, বিজয়দা?"

"না ভাই; এবারে আর হলো না। একদফা বিয়ে করে' বয়ে গেছি। তারপরে তুমি এই নানা খানা করে' কি কম ভোগালে, ভাই? সত্যি, বসন্, তুমি এই মাথার ব্যামো না করে বস্‌লে, বোধ হয়, এবারে তরে' যেতে পারতাম।"

বসন্ত তাহা জানিত; তাই সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া

শুধু বলিল, "আসছে বছর দেখা যাবে। তারপর—কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?"

"ওঃ তা বলিনি বুঝি। দিল্লি যাচ্ছি বউকে নিয়ে, আমার শ্বশুরের ওখানে রাখ্‌তে যাচ্ছি। তারপর তোমার কতদূর গমন হবে, শুনি ?"

বিজয় তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে শুনিয়া বসন্তের ইচ্ছা হইল, প্ল্যাটফরম হইতে ছুটিয়া পলায়। সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বিজয় তাহাকে ধাক্কা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?"

বসন্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "এলাহাবাদ।"

"বাস, তা হলে ঝাঁ করে আমার গাড়ীতে উঠে বোসো ত ! আমি রাত্রিকার জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসি।" বলিয়া বিজয় বসন্তকে টানিতে টানিতে গাড়ীর মধ্যে উঠাইল। বসন্ত একবার মিনতি করিয়া বলিল, "বিজয়দা, খাবার আমি নিয়ে আসছি, তুমি বোস, দোহাই তোমার।"

বিজয় তাহাকে জোর করিয়া গাড়ীর ভিতরে পূরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং ছুটিয়া খাবারের দোকানের দিকে গেল। যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "তোর বৌদিকে ছেড়ে যেন পালাস না !"

বসন্ত নিস্পন্দভাবে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী যে রমণী বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। বসন্তের

মনে হইল যেন এখনি তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। সে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

বিজয় খাবার কিনিয়া ফিরিয়া আসিতেই বসন্ত নামিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বিজয় তাহাকে কোনমতে নামিতে দিল না। কুলিকে সঙ্কেতে বসন্তের মালপত্র আনিতে বলিয়া বিজয় খাবারের পাত্রটি স্ত্রীর হস্তে দিল।

"ওহো, তোমাদের পরিচয় করে' দেওয়া হয় নি। আজ-কালকার নিয়মানুসারে কেউ পরিচয় না করে' দেওয়া পর্য্যন্ত যে আলাপ কর্‌তে নেই, সে কথাটি আমার মনে ছিল না। ইনি হচ্চেন্ শ্রীমান্ বসন্ত বিহারী দত্ত, আমার বন্ধু, বাংলা কথায় আমার ছোট ভাই। আর ইনি হচ্চেন গিয়ে আমার-শ্রীবিষ্ণু তোমার—বৌদি। এই বারে নাও।"

বসন্ত নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল; বিজয় একটু অপ্রতিভ হইয়া তাহার স্ত্রীর দিকে তাকাইল। তিনি ততক্ষণ দুইখানি পাতায় খাবার সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বিজয়ের দিকে একখানি পাতা সরাইয়া দিতেই সে বলিল, "বাঃ, আগে তোমার দেওরকে দেও।"

বিজয়ের স্ত্রী মাথার কাপড় একটু টানিয়া, একখানি পাতা দু'হাতে লইয়া বসন্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে; বসন্ত মোগল সরাইয়ের দ্রুত পলায়মান সৌধ-রাজির দিকে অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত তাকাইয়া ছিল।

বিজয়ের স্ত্রী খাবারের পাতা হাতে করিয়া যখন তাহার

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সে উঠিয়া নতমুখে একটি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সরসী—বিজয়ের স্ত্রী—মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া প্রতি-নমস্কার করিল এবং হাসিয়া বলিল, "কিছু খেয়ে নিন।"

বসন্ত নিস্তব্ধ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই, ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। বিজয়ও তাহার স্ত্রী মনে করিল, গাড়ীর বেগের জন্য বসন্ত পড়িয়া গেল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তাহার মনে অকস্মাৎ এমন একটি সংশয়ের ধাক্কা খাইল যে, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ ত সে নহে। প্রতিদিন যাহার মুখখানি দেখিয়া আকুল পিপাসা চরিতার্থ হইত, এ ত সে নহে। সে তবে কে?

যন্ত্রচালিতের মত বসন্ত সরসীর হস্ত হইতে খাবার লইয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার চোখ মুখ এক অপূর্ব্ব উজ্জলতায় ভরিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার খাবার ফুরাইল। সরসী আবার তাহাকে খাবার আনিয়া দিল। বিজয় মনে করিল, "ভায়া আমার এবার খাদ্যের প্রতি সুবিচার করিতে শিখিয়াছে; পরিবেশনের গুণে ক্ষুধা বাড়ে কিনা!"

সে খাইতে খাইতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। সরসীও সে হাসির প্রত্যুত্তরে হাসিল।

বসন্ত আপন মনে খাইতেছে; আবার যখন তাহার পাত্র শূন্য হইল, তখন সরসী জিজ্ঞাসা করিল, "আর দেবো—অন্ততঃ একটা মিহিদানা?"

বসন্ত মাথা নাড়িয়া বুঝাইল আর চাই না। সরসী কিন্তু আর একটী মিহিদানা তাহার পাতের উপর দিল। বসন্ত আর আপত্তি না করিয়া সেটিও খাইল।

সরসী কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া বসন্তের সম্মুখে ধরিল; বসন্ত অন্যমনস্কভাবে জলের গেলাসটি লইতে গিয়া সরসীর গায়ে সমস্ত জলটি ঢালিয়া ফেলিল। বিজয় ও তাহার স্ত্রী হাসিয়া আকুল হইল; বসন্ত অপ্রতিভ ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে কেবল একটি প্রশ্ন হইতেছিল, সে কে তবে? ইনি যদি কার্ত্তিক বাবুর কন্যা, তবে তিনি কে? বিজয় তাহার চিন্তার সূত্র কাটিয়া দিয়া বলিল, "গত সপ্তাহে তোমার বাবার এক চিঠি পেয়েছি, তিনি কি লিখেছেন, জান?"

বসন্ত তাহার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল।

বিজয় তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "তোমার একটা বিয়ে শীঘ্র জুটিয়ে দেবার জন্যে।"

সরসী একটু হাসির পুলকে জানাইয়া দিল, "আমিও তার মধ্যে আছি।"

বিজয় বলিল, "বড় ভাল কর্‌তে, বসন্ যদি কেদার বাবুর মেয়েটিকে বিয়ে কর্‌তে।"

সরসী সায় দিল, "পিসেমশায় নিজে এসে এত করে বল্লেন—"

বিজয় বলিল, "সে মেয়েটি বড় ভাল ছিল কিন্তু।"

সরসী বলিল, "কেন, উনি ত তাকে দেখেছেন—"

বসন্ত যেন আপনার মনে বলিল, "আমি দেখেছি ? কই আমি ত কোনও মেয়ে দেখিনি—"

সরসী বিজয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন, আমাদের বাড়ী থেকে ওঁরই পড়বার ঘর দেখা যেত, না?—আমরা ত ওঁকে দেখেছি।"

এবার আর বসন্তের বুঝিতে বাকী রহিল না। মাঘ মাসের দিনেও তাহার কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল।

সরসী বলিল, "এই ২৭এ তার বিয়ে!"

বসন্ত তাহার চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি সরসীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া, একটু অতিরিক্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে ২৭শে ?"

সরসী সে আগ্রহের অর্থ বুঝিতে পারিল না ; বলিল, "আমার পিসতুতো বোন্—প্রতিভার। আমরা ত কাল মেদিনীপুর যাব, ঠিক ছিল ; তারপর বাবার টেলিগ্রাম সব উল্‌টে দিলে!" সরসী বিজয়ের মুখের দিকে চাহিল।

"কেদারবাবু আমাকেও বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন, সেখানে যাবার জন্যে। ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ের জন্য কি বিব্রতই হয়েছিলেন। আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।"

সরসী বুঝিল, তাহাকেও একটু ইঙ্গিত করা হইল। সে বিজয়ের মুখের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

বসন্ত এসব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। চুনার ষ্টেশনে

যখন গাড়ী থামিল ; তখন বসন্ত হঠাৎ বিজয়কে বলিল—"আমার এখানেই নাম্‌তে হবে ; আমি পরের ট্রেণে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।"

বলিয়াই সে নামিয়া পড়িল এবং কুলী ডাকিয়া তাহার জিনিষপত্র নামাইয়া লইল।

"বৌদি আসি" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া অদৃশ্য হইল। বিজয় আপত্তি করিবার অবসর পাইল না ; তাহার স্ত্রীকে দুঃখের স্বরে বলিল, "ওর মাথার অসুখ এখনও কিচ্ছু কমে নি।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা নীরব রহিল।

৫

মেদিনীপুর ডাকবাঙ্গলায় বসন্ত অধীরভাবে পায়চারি করিতে-ছিল। সে কোন মতেই মতি স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে, কেদার বাবুর সহিত কি প্রকারে দেখা করা যাইতে পারে। প্রতিভার বিবাহের আর দুই দিনমাত্র বিলম্ব আছে ; এখন যদি সে বলে আমি সম্পূর্ণ ইচ্ছুক আছি, তাহাতেই কি একটা স্থির সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে ? হয় ত যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, সে সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যপাত্র। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বসন্তকে গ্রহণ করিবার কি এমন সম্ভাবনা থাকিতে পারে ? সে ভাবিতে লাগিল, মেদিনীপুর আসিয়া ভাল করে নাই।

এমন সময় "Hallo, Mr. Datta" বলিয়া একজন সাহেব বেশী ভদ্রলোক তাহার করমর্দ্দন করিলেন। সে দেখিল ডাক্তার কর। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

"আপনি এখানে ?"

"তুমি এখানে ?"

"হ্যাঁ, আমি এখানে একটু প্রয়োজনে এসেছিলুম।"

"আমি এসেছি যে জন্যে বুঝতেই পাচ্ছ—রোগী দেখতে। কেদারবাবুর একটি মেয়ে বড় পীড়িত।"

বিজয় ও বসন্তের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, ডাক্তার কর মনে করিয়াছিলেন যে, কেদারবাবু নিশ্চয়ই বসন্তেরও সুপরিচিত।

"কেদার বাবুর মেয়ে বড় পীড়িত?" আস্তে আস্তে বসন্ত এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিল।

"হ্যাঁ তার ফিট্ হচ্চে, পরশু বেচারীর বিয়ে, সব ঠিকঠাক ; —কি বিপদ !"

"আপনি কি তাঁকে দেখে এলেন ?"

"হ্যাঁ, ষ্টেশন থেকে আগে তাকে দেখতে গেছ্‌লুম।"—বলিতে বলিতে ডাক্তার কর অপর একটি কক্ষের দিকে গেলেন। সেখানে তাঁহার খানসামা জিনিষপত্র সব পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সে অগ্রসর হইয়া ডাক্তার করের টুপী ও ছড়িটা লইল।

বসন্ত সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, রোগীর অবস্থা কেমন ?

ডাক্তার কর তাহার সাগ্রহ দৃষ্টি দেখিয়া বলিলেন, "উপস্থিত কোনও আশঙ্কার কারণ আছে ব'লে ত মনে হয় না। তবে 'হার্ট' বড় দুর্বল; বেশী ফিট্ টিট্ হলে কি হয় বলা যায় না।"

ডাক্তার কর বিশ্রাম করিতে গেলেন, বসন্ত ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে গেল। অনেকক্ষণ পরে যখন সে ফিরিল, তখ ডিনার খাইয়া ডাক্তার কর শুইয়া পড়িয়াছেন। বসন্ত বাঙ্গলার খানসামাকে বলিল, সে রাত্রে কিছু খাইবে না। 'ব আচ্ছা' বলিয়া খানসামা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

বসন্ত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। রাত্রি দুইটার সময় বারান্দায় জুতার শব্দ শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। আগন্তুক ডাক্তার করের দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। ডাক্তার কর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?"

"আমি মণি, প্রতিভার আবার ফিট হয়েচে, আপনাকে বাবা এখনি যেতে বলেছেন।"

"এত রাত্রে গিয়ে আর কি হবে? সেই ওষুধটা আর এক দাগ খাইয়ে দাওগে।"

"সে খাওয়ান হয়েচে; এখন অবস্থাটা বড় খারাপ বলে বোধ হচ্চে। আপনি শীগ্‌গির উঠে আসুন দয়া ক'রে।"

বসন্তও কম্বল জড়াইয়া ডাক্তার করের দরজায় আসিল।

ডাক্তার কর দরজা খুলিয়া আগন্তুককে বলিলেন, "এত রাত্রে আমার যাওয়া অসম্ভব। কাল সকালে যাওয়া যাবে, বুঝলে?"

কেদারবাবুর পুত্র কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। নিকটাগত বিপদের ঘনীভূত ছায়া তাহার হস্তস্থিত লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখমণ্ডলে লক্ষিত হইল। ডাক্তার কর এতক্ষণ বসন্তকে লক্ষ্য করেন নাই, সে মণির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বসন্ত অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বলিল, "আপনার পায়ে পড়ি, ডাক্তার কর, আপনি একবার দেখে আসুন।"

মণি অবাক হইল। ডাক্তার কর একটু চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন, "এই অন্ধকার রাতে বুড়ো মানুষকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবে, তা হবে না, বাপু। তুমিও এস—তা হ'লে আমি যাচ্ছি।"

বসন্ত বলিল, "আমি এখনি প্রস্তুত হচ্ছি।"

ডাক্তার করও খানসামাকে ডাকিয়া উঠাইলেন এবং কাপড় জুতা পরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ডাক্তার করের সহিত রোগিনীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া, তাঁহারই নির্দ্দেশমত কখন যে বসন্ত শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। নিশাশেষে ঝরা শেফালিকার মত বালিকার কুসুম-পেলব কান্তি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। তাহার স্পন্দহীন দেহ শয্যার সহিত যেন মিলাইয়া গিয়াছিল। বসন্ত তাহার নাকের কাছে ঔষধ ধরিতেই অক্ষি-পল্লব একটু কম্পিত হইয়া উঠে; আবার দেহ অসাড় হইয়া পড়ে। ডাক্তার কর পুনঃ পুনঃ নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একবার সে চক্ষু মেলিল; চক্ষুর দৃষ্টি চারিদিকে সঞ্চালিত হইয়া বসন্তের উপর পতিত হইল! সে দৃষ্টিতে বসন্তের চোখে অশ্রুধারা বহিল; বালিকা একদৃষ্টে শুধু তাহাকেই দেখিতে লাগিল। তারপর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ডাক্তার কর প্রত্যুষে বিদায় লইয়া ডাক বাঙ্গলায় আসিলেন। বসন্তকে কেদারবাবু যাইতে দিলেন না। ডাক্তার করও বলিলেন, "বসন্ত শুশ্রূষা করে ভাল।"

প্রতিভার ঘুম ভাঙ্গিলে সে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং গত রাত্রিতে ফিট্ হইবার পূর্ব্বে যেমন ছটফট্ করিয়াছিল, তেমনই ছটফট করিতে আরম্ভ করিল। বসন্ত আবার গিয়া তাহার নাকে ঔষধ প্রয়োগ করিল। এবারে রোগী ঘুমাইল না; শুধু বসন্তের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রতিভার বিবাহের দিন ফিরিয়া গেল। সে একটু সুস্থ হইলেই বসন্ত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে জানাইল যে, সে কেদার বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছে। রামকমল বাবু আনন্দভরে সেই দিনই কেদারবাবুকে চিঠি লিখিলেন।

কেদারবাবু পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ফাল্গুনে এক শুভ সন্ধ্যায় কেদারবাবুর দুই কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। প্রতিভার জন্য অন্য যে পাত্র স্থির করা হইয়াছিল,

তাহার সহিত সুরমার বিবাহ দিতে কেদারবাবুকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

বিবাহের পর প্রতিভা একদিন বসন্তকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়াছিল, "তুমি সেদিন শেষরাত্রে না আসিলে আমার সে রাত্রি প্রভাত হইত না। তুমিই আমার জীবনের শুকতারা।"

মন্দের ভালো

১

মিসেস্ খাস্তগীরের ছেলেবেলার আদরের নাম ছিল মিনি, ভাল নাম ছিল মৃণালিনী এবং বিবাহের পরে ব্যাঙাচির লেজের মত এ দুই নামই খসিয়া গিয়া, হইয়াছে একেবারে মার্জরী। মিসেস্ মার্জরীকে ঈর্ষাপরায়ণা প্রতিবেশিনীরা মার্জারী বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িত না। তবে একটা সুবিধা ছিল এই যে, পাড়ার কাহারও সহিত ইঁহাদের কোনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাহার কারণ শিমলা পাহাড়ে যে পল্লীতে মিসেস্ শ্রীমতী খাস্তগীর বাস করিতেন, সে পাড়ায় ছিলেন জনকয়েক মান্দ্রাজী, দু'এক ঘর বাঙ্গালী ও অবশিষ্ট ফিরিঙ্গি। মিষ্টার খাস্তগীর বড় লাটের দপ্তরে কাজ করিতেন এবং পূরা সাহেব ছিলেন। তাঁহার বাড়ীর নাম ছিল 'কেণ্টাকী গ্রোভ্'।

মিঃ খাস্তগীরের পূরা নাম ছিল ভবানন্দ। তাঁহার দরজায় পিত্তল ফলকে উৎকীর্ণ ছিল Mr. B. A. Khastgir. কখনও কখনও খাস্তগীর সাহেব নাকি নামটি ফিরাইয়াও লিখিতেন Khastgir B. A. ইহাতেও তিনি যে বি, এ পাশ, সে বিষয়ে দুষ্ট লোকের মনে খট্‌কা লাগিত না, এমন নহে।

বস্তুতঃ খাস্তগীর সাহেবের বিদ্যা যে কতদূর, তাহার খবর খুব কম লোকই রাখিত। অফিসে প্রচার ছিল তিনি বিলাত ফেরত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই, তিনি বোম্বাই হইতেই ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার বিলাত গমনের কাজ হইয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ বিলাতের চাল চলন হাবভাব ইত্যাদি তিনি অনেকটা বম্বে বসিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বিলাত যাইবার অজুহাতে মৃণালিনীর পিতার নিকট হইতে যে দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক হাজার বাদে আর নয় হাজার টাকা তাঁহার হস্তগত হওয়াতে আর্থিক স্বচ্ছলতা হইয়াছিল বিশেষ।

কথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্। ভবানন্দ যখন কলেজে পড়েন, তখন তাঁহার ভগ্নীপতির নিকট কাণপুরে বেড়াইতে আসেন। এই সময়ে মৃণালিনীর পিতা রামগোপাল অধিকারী কাণপুরের সদরালা। প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া এক মহা সমস্যা। মৃণালিনী শুক্ল পক্ষের চন্দ্রকে ধিক্কার দিয়া ষোলকলা পার হইয়া উনবিংশ কলায় পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। ভবানন্দকে দেখিয়া রামগোপালের বেশ পছন্দ হইল। কন্যাদায়-মোচনের এমন সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এক অসুবিধা ছিল এই যে, ভবানন্দের সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে, তার উপর লেখা পড়া—পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত টানাটানি করিয়াও সে তাহার কোনও কূল কিনারা পায় নাই। রামগোপালের কন্যাটি কিন্তু

অনেক শিখিয়া ফেলিয়াছিল। কাণপুরের এক পাদরিণী, ফিরিঙ্গি মেয়েদের লইয়া একটি স্কুল করিয়াছিলেন; তাঁহার স্কুলে অষ্টাদশবর্ষ পর্য্যন্ত মিস্ মিনি অধিকারীর শিক্ষাদীক্ষা রীতিমত হইয়াছিল। রামগোপাল দেখিলেন জামাতাকে এক বার বিলাত ঘুরাইয়া আনিতে পারিলে ঠিক 'পাষাণ ভাঙ্গা' হয়। কন্যা-জামাতার মধ্যে ওজনের যে তারতম্য আছে, তাহা রামগোপাল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সংকল্প মনে উঠিতেই রামগোপালের বক্ষ ব্যারিষ্টার জামাতালাভের সৌভাগ্য-সুখ-কল্পনায় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ স্ফীত হইয়া উঠিল। কত ভাল ভাল ব্যারিষ্টার তাঁহার আদালতে মোকদ্দমা করিতে আসিয়া তোরঙ্গ বোঝাই করিয়া টাকা লইয়া গিয়াছে, সে কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

শুভদিনে শুভ লগ্নে বিবাহ-সংস্কার নিষ্পন্ন হইয়া গেল। স্থানীয় হিন্দুস্থানী ও সাহেব বাবুরা ভবানন্দের কর নিষ্পেষণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিলেন। সাহেবেরা কেহ কেহ 'ববানণ্ডে'র অতুলনীয় সৌভাগ্যে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িলেন না। তাঁহারা অনেকেই মিনিকে চিনিতেন। পশ্চিমের বাঙ্গালী মেয়েরা পরদা মানিয়া উঠিতে পারেন না।

পি, এণ্ড ও কোম্পানীতে ভবানন্দের জন্য টিকিট কাটা হইল। র‍্যাঙ্কেন কোম্পানী কাটা পোষাক সরবরাহ করিলেন। যাত্রার দিন স্থির হইয়া গেলেই, ভবানন্দের ভগ্নীপতির নির্ব্বন্ধে রামগোপাল বাবু টমাস্ কুকের হিসাবে (খরচ বাদে) ন' হাজার

একশ' এক টাকা জমা করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট টাকা পি, এণ্ড ও, এবং র‍্যাঙ্কেনকে দিতে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহার হিসাব রামগোপাল ভবানন্দকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন :— "বাপু আমার কথাও যা', কাজও তাই; তোমার ভগ্নীপতিকে বলো।"

বিবাহের পর ভবানন্দ কোনও গতিকে কাল-রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া ফুলশয্যার রাত্রিতে মিনিকে জিজ্ঞাসিল :—

"আমি বিলাত গেলে তুমি খুসী হও, না—না গেলে খুসী হও?"

মিনি ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিল :—"কেন, তোমার ত বিলাত যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে।"

"যদি না যা……ই?"

"সে বাপু আমি জানি না।"

সে দিকে উৎসাহ না পাইয়া, ভবানন্দ একটি বেশ দীর্ঘ রকমের নিঃশ্বাস বক্ষপঞ্জরের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া বলিল :—

"ফিরে আস্তে তিন বছর ত লাগবেই—বেশীও লাগতে পারে। তোমার কোনও কষ্ট হবে না?"

মিনি একেবারে নিঃসংশয়ে বলিল—"না, কষ্ট আবার কি? বাপমায়ের কাছে থাকলে আবার কষ্ট কি?"

ভবানন্দের একটা ছোটখাটো বাসভবন যে না ছিল, তা নয়। কিন্তু তাহার পিতামাতা কেহ না থাকায়, সে জোর করিয়া

বলিতে পারিল না যে, 'এখানে থাক্‌বে কেন? আমার বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌বে।' শ্বশুর ভবনে যাইবার নাম শুনিলে হয় ত মৃণালিনীর উৎসাহের আবেগটা একটু কমিতে পারে, এই মনে করিয়া একবার ভবানন্দের ইচ্ছা হইয়াছিল, সে বলে; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। তখন ভবানন্দ মনে মনে স্থির করিল যে, প্রথম দর্শনেই আমি যেমন হৃদয়খানি হারাইয়া ফেলিয়াছি, মৃণালিনীর বোধ হয় ততটা হয় নাই। যাহা হউক, বিলম্বেই সুমিষ্ট ফল পক্কতা প্রাপ্ত হয়, মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ভবানন্দ চট্‌ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, তারপর নিরন্তর স্বামীর নাসিকাধ্বনিতে ঘুম আসিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে করিয়া মাতার বিছানার এক পার্শ্বে গিয়া ঘুমাইল।

যথাসময়ে যাত্রা করিয়া ভবানন্দ বম্বে মেলে আরোহণ করিল। বম্বে গিয়া সমুদ্রের ভীষণ ঢেউ দেখিয়াই হউক, অথবা মিনির হাস্যোচ্ছল মুখখানি মনে পড়িয়াই হউক, ভবানন্দের পদযুগল জাহাজের কামরার অভিমুখে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। কাণপুর হইতে যাত্রা করিয়া আসিবার দিন ভবানন্দের চোখ দিয়া দু চার ফোঁটা জলও পড়িয়াছিল, এবং আরও পড়িবার জোগাড়ে ছিল, তাহা দেখিয়া মিনি বেচারী হাস্য সংবরণ করিতে পারে নাই। ভবানন্দ চট্‌ করিয়া কামিজের সু-পালিশ 'কফে'

চোখ মুছিয়া লইয়া অনিমেষ নয়নে মিনির সেই হাস্যবিস্ফারিত বদনমণ্ডলের দিকে চাহিয়া ছিল।

ব্যালার্ড পিয়ারে পৌঁছিয়া সেই মুখখানিই কেবল মনে পড়িতে লাগিল। সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বিপ্রহরে যত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, ভবানন্দের ভাবসাগরে ততই প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া, অনবরত ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতে তাহার হৃদয়-তরণীকে ঐ জাহাজেরই মত দোলা দিতে লাগিল। এক সময়ে এমন সম্ভাবনাও হইল, যে মনের কথা হঠাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনর্গল বাহির হইয়া পড়ে!

দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহির হইয়া ভবানন্দ এক দৌড়ে গিয়া, মনের আবেগে এক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল এবং হস্তের দ্বারা সম্মুখে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। চালক দ্রুতবেগে হাতোল ঘুরাইয়া বুঝাইয়া দিল, সাহেবের সময়ের মূল্য তারও জানা আছে। জিনিষপত্র যথারীতি জাহাজে উঠিয়াছে। নিজের বিলাত গমন সম্বন্ধে ভবানন্দের মনে সন্দেহ জন্মিলেও, তাহার স্যুটকেস্ বিছানা প্রভৃতির আসন্ন বিলাত গমনে কোনও সন্দেহই রহিল না! তাহার নিজের কাছে একটি হ্যাণ্ড ব্যাগ মাত্র ছিল। তাহাকেই সম্বল করিয়া সে মোটরে উঠিয়া বসিয়াছিল; মোটর নক্ষত্রবেগে ছুটিল।

কিছুদূর গিয়া মুখ ফিরাইয়া শোফেয়ার হাঁকিল, 'কাঁহা যাইয়েগা?' সেটা যে কত বড় অনিশ্চিত ছিল, তাহা ভবানন্দ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। ভবানন্দ পুনরায় হস্তের

দ্বারা ইঙ্গিত করিল। মোটর চলিতে লাগিল। সহরের সীমা ছাড়িয়াও বহুদূর আসিয়া পড়িল। আবার শোফেয়ার জিজ্ঞাসা করিল;—এবারে একটু রুক্ষভাবে। কিন্তু ভবানন্দ ভাবিত; কথা কহে না। লোকে পরিহাসচ্ছলে অনেক সময়ে বলিয়া থাকে যে, বোবার শত্রু নাই। কথাটা অনেক সময়ে খাটে না, এক্ষেত্রেও খাটিল না। শোফেয়ার দু'তিন বার জিজ্ঞাসার পর মোটর থামাইল, এবং গাড়ী হইতে নামিয়া আস্তেন গুটাইয়া রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভবানন্দকে আহ্বান করিল।

ভবানন্দ ভাব দেখিয়া আতঙ্কিত হইল; তখন সে হঠাৎ প্যাণ্টুলনের পকেট হইতে পাঁচটি মুদ্রা বাহির করিয়া শোফেয়ারের মুষ্টিবদ্ধ হস্তে জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিল এবং বলিয়া ফেলিল—"বেমার হ্যায়; হাঁসপাতালমে লে চলো।"

ব্যারামের কথায় যত না হউক, পাঁচটি মুদ্রার শীতল স্পর্শে ভাটিয়া মোটর চালকের ক্রোধ প্রশমিত হইল। সে মোটর ঘুরাইয়া লইয়া চালাইয়া দিল এবং অবিলম্বে গোকুল দাস তেজপাল হাঁসপাতালের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। ভবানন্দ দেখিল তাহার মস্তকে মন্দ বুদ্ধি জোগায় নাই। সে চুপ করিয়াই রহিল। শোফেয়ার তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ডাক্তারের সম্মুখে হাজির করিল। সেখানেও ভবানন্দ মৌন; ইংরাজীতে এই মাত্র বুঝাইয়া দিল যে, সে পীড়িত। কি পীড়া, লক্ষণ কি? এসব প্রশ্ন সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না; এইরূপ ভাব করিল। শোফেয়ার ভাড়া চাহিতেই

প্যান্টুলনের পকেট হইতে কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া দিল, একবার গণিয়াও দেখিল না।

এবংবিধ ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া ডাক্তার তাহাকে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া স্থির করিলেন এবং একটি ঘর তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ঘরটি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার। সেই ওয়ার্ডের বিকৃতমস্তিষ্ক রোগিগণের কোলাহলে কিছু অসুবিধা ঘটিলেও মোটের উপর সমুদ্র মধ্যে ভীষণ তরঙ্গ দোলায়িত অর্ণবপোতের ক্ষুদ্র কেবিন হইতে শত সহস্র গুণে ভাল মনে হইতে লাগিল।

কেহ তাহাকে দর্শন করিতে আসিলেই, ভবানন্দ মস্তকে বারংবার তর্জ্জনী ঠুকিয়া মৌন ভাবে জানাইয়া দিত যে, তাহার শরীরের ঐ অংশের কল কবজা বিলকুল বিগড়াইয়া যাইতে বসিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে ঘুম পাড়াইবার ঔষধ দিলেন এবং তেড়ী ফিরানো চুলগুলির মাঝখান হইতে নির্ম্মমভাবে কতকগুলি কাটিয়া লইলেন। ভবানন্দ আয়নায় দেখিল, তাহার চেহারা কতকটা দক্ষিণী ব্রাহ্মণের মত হইয়াছে। এক্ষণে কপালে গোটা-কতক ঋজু ঋজু ঊর্দ্ধ রেখা টানিতে পারিলেই হয়!

গোকুল দাস তেজপাল হাঁসপাতালে এক জন নূতন সাহেব ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি মানসিক ব্যাধির বিশেষতত্ত্বজ্ঞ। তাঁহারই হস্তে ভবানন্দ সমর্পিত হইল। যুবক ডাক্তার মনস্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া অনেক বেতনে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। কতকগুলি বদ্ধ পাগলের চিকিৎসা তাঁহার স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়াতে,

তিনি কিছু বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় তাহাদের পাগলামী দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল। কিন্তু ভবানন্দকে রোগি-রূপে পাইয়া তিনি একটু আরাম বোধ করিলেন। কারণ সূত্রপাতেই তাঁহার চিকিৎসা ফলবতী হইতে আরম্ভ করিল। তিনিও খুব উৎসাহের সহিত ভবানন্দের চিকিৎসায় মনোযোগ করিলেন এবং কেসের (case) এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে সুরু করিলেন। ভবানন্দের কথাবার্ত্তায় উত্তরোত্তর জ্ঞানের লক্ষণ-বিকাশ দেখিয়া তিনি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতে লাগিলেন। অন্ততঃ একটিও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগী যে তাঁহার চিকিৎসায় উন্নতি লাভ করিতেছে, এই বিজয়োল্লাসে তাঁহার সুপরিসর বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল এবং তিনি খুব জোরে জোরে পাইপ্ টানিতে লাগিলেন।

ভবানন্দের অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া রামগোপাল বাবু ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ভাব গতিক দেখিয়া ফেরত ট্রেণেই তিনি কাণপুরে পৌঁছিয়াছিলেন। জামাতার বিলাত যাত্রা এমন অসম্ভাবিতরূপে পণ্ড হইয়া যাওয়ায়, তিনি ছোটখাটো একটি আঘাত হৃদয়ে বহন করিয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার স্নেহের কন্যা সেই আঘাতে একেবারে নুইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তিনি কাণপুরে সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন না। স্বামীর অসুখের সংবাদ পাইয়া, মৃণালিনী একদিন চায়ের সঙ্গে টোষ্ট্ কোনও মতেই খাইল না।

এদিকে ভবানন্দ সেই সাহেব বিশেষজ্ঞের যত্ন ও চিকিৎসায়

খুব দ্রুত আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। ডাক্তারের বাড়ীতে তদুপলক্ষে এক সান্ধ্য সম্মিলন আহূত হইল, স্থানীয় অনেক ডাক্তার ও প্রধান লোক নিমন্ত্রিত হইলেন, ভবানন্দকে একখানা কুশন-মণ্ডিত চেয়ারে সযত্নে শয়ান করাইয়া তিনি সহাস কৌতুকে সব লোক ডাকিয়া ডাকিয়া দেখাইলেন। ডাক্তারদের নিকটে তিনি যে রোগের নিদান ও অনুক্রমের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে বেচারী ভবানন্দের রোগের আভাস মাত্র হইতেও বঞ্চিত বদন-মণ্ডলে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত হইল; সে চেয়ারে বসিয়া শয্যাকণ্টকগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ডাক্তারের মহিলা বন্ধুরা তদ্দর্শনে দূরে সরিয়া পড়িলেন।

ডাক্তার সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে রোগীর মস্তিষ্ক যেরূপ ভয়ানক বিকৃত হইয়াছিল, তাহাতে এই সময়ের মধ্যে একেবারে আরোগ্য লাভ করা অসম্ভব। তবে আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে যে অভাবনীয় উপকার দর্শিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান মস্তিষ্ক-চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। দুই একজন দেশী ডাক্তার সাহেবডাক্তারকে অভিনন্দন করিবার সময়ে যে একটু সন্দেহের হাসি অধর কোণে ফুটাইয়া ছিল, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না।

মজলিস্ যখন ভাঙ্গিয়া গেল তখন তিনি যত্ন সহকারে নিজের মোটরে করিয়া ভবানন্দকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ভবানন্দ ডাক্তার সাহেবের নিকট

হাজির হইয়া বলিল—"সাহেব এইবার বর দাও। যে ব্যাধি তুমি দয়া করিয়া সারিয়া দিলে, আবার সে অসুখে না ধরে, তার ব্যবস্থা করিয়া দাও। এখন খাইব কি করিয়া, তাহা বল।"

সাহেব বলিলেন—"ঠিক বলেছ, এটা আমারই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। যে মানসিক ব্যাধিতে তোমাকে ধরিয়াছে, তাহাতে তোমার একটা অর্থাগমের পথ আবিষ্কার করিয়া দিতে না পারিলে, আমার সব চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে!"

সাহেব তৎক্ষণাৎ দন্তের মধ্যে পাইপটি চাপিয়া ধরিয়া একখানি সুপারিষ পত্র লিখিতে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা কড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে কি!"

ভবানন্দ বলিল:—"বিলক্ষণ, তা আর নেই! আমার শ্বশুরের টাকা কড়ি লইয়া অনেক দিন কারবার করিতেছি। তিনি আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ব্যবসায়ে আমাকে অংশীদার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে আরও উচ্চতর কার্য্যে চালিত করিতেছে। এক্ষণে, সাহেব, তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।"

সাহেব দ্রুতবেগে একখানি চিঠি লিখিয়া ভবানন্দের হস্তে দিলেন। ভবানন্দ সেই মহাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরদিন মার্কিণ ট্রেডিং ব্যাঙ্কের বড় সাহেবকে আক্রমণ করিল। বড় সাহেব তাহাকে প্রধান কেরাণীর অস্থায়ী সহকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন।

৩

ছয়মাস কাল মার্কিণ ট্রেডিং ব্যাঙ্কে হাত পাকাইয়া ভবানন্দ যখন কাণপুরে পদার্পণ করিল, তখন তাহাকে সকলে সম্মান না করিয়া পারিল না। কারণ সকলেই বুঝিতে পারিল যে, ভবানন্দ যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহে, যেরূপ ভাবে চলে, যেরূপ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করে, যেরূপ ভাবে শিস্ দেয়, তাহাতে সে নিশ্চয়ই অনেক উচ্চপদের দাবী লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। রাম গোপালও ভাবভঙ্গী দেখিয়া প্রথমটা সেইরূপ ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন যে, বাবাজি রীতিমত তাঁহার গৃহেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার যোগাড় করিতেছেন, তখন তিনি ও তাঁহার স্ত্রী জামাতৃ-তর্পণের বিষয়ে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়িলেন; ষোড়শোপচার হইতে দশো-পচার এবং দশোপচার হইতে ক্রমে পঞ্চোপচারে নামিয়া আসিল। তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া পড়িল।

এক দিন মিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিয়া ফেলিল যে, সে মিস্ এলিসের স্কুলে পনেরো টাকা মাহিনায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছে। ভবানন্দ বুঝিল যে, দু'দিন একটু বিশ্রাম করিবার স্থান এসংসারে—এমন কি শ্বশুর বাড়ীতেও—দুর্লভ! সে তাহার পুরাতন বন্ধু ডাক্তার সাহেবকে পত্র লিখিল:—তাহার মানসিক ব্যাধি—যাহা তাঁহার সুচিকিৎসা-গুণে

একেবারেই সারিয়া গিয়াছিল—তাহা আবার বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা হইয়াছে। সত্বর প্রতিবিধান না করিলে, কি হয় বলা যায় না।

ডাক্তার সাহেব প্রত্যুত্তরে অনেক আশ্বাস বাক্য লিখিলেন এবং মার্কিণ ব্যাঙ্কের বড় সাহেবের নিকট হইতে খুব জোরালো এক পরিচয়-পত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিবের বরাবর পাঠাইয়া দিলেন।

ভবানন্দ সেই পরিচয়-পত্র ও প্রিয় পরিবার সহ দিল্লী রওনা হইল ও চাঁদনী চকের উপরে, ফিরিঙ্গি-পরিচালিত এক হোটেলে বাসা লইল। রাজস্ব-সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই তিনি হাঁ না কিছু না বলিয়া সেক্রেটারীর নিকটে মার্কিণ ব্যাঙ্কের বড় সাহেবের চিঠিখানা সহ তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। সেক্রেটারীও তাঁহাকে কোনও আশাই দিতে পারিলেন না। কর্ম্ম খালি হইলে বিবেচনা করা যাইবে, এইরূপ এক সুদূর সম্ভাবনার একান্ত অনিশ্চিত আভাস দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ভবানন্দ ছাড়িবার পাত্র নহে, সে সাহেবের বাড়ীতে প্রতিদিন দুইবার করিয়া হাজিরা দিতে লাগিল এবং পরিবারের মৃণাল বাহু নিজ ভুজবন্ধনে বেষ্টন করিয়া আলিপুর রোড দিয়া প্রতি সায়াহ্নে পদচারণা করিতে লাগিল।

শীঘ্রই সাহেব মহলে ভবানন্দের সুনাম পড়িয়া গেল। এই নবাগত খাস্তগীর দম্পতী যে দেশীয়দিগের মধ্যে অতি উচ্চ-

শিক্ষাপ্রাপ্ত, ইহা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইয়া গেল। সাহেবেরা প্রথমতঃ ছড়ি, পরে হাত এবং তৎপরে টুপী উঠাইয়া দম্পতীকে সম্মান দেখাইতে লাগিল। সাহেবদের সহিত ভবানন্দের যেমন যেমন পরিচয় হইতে লাগিল, মিনিকেও তাহাদের সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল।

মিনি ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়াছে, সাহেবী চালচলন কতকটা অভ্যাস করিয়াছে, পশ্চিমে থাকিয়া থাকিয়া অতিরিক্ত লজ্জাশীলতাকেও বিদায় দিয়াছে, কিন্তু এমনভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় যার তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে, সে একান্তই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বুঝাইল যে, বিলাতী নিয়মে স্ত্রীই স্বামীর উন্নতির একমাত্র সোপাণ। এ বিষয়ে দেশীয় প্রথা অবলম্বন করিলে উৎসন্ন যাইতে হইবে। বিলাতে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ, তাঁহাদের স্ত্রীরাই প্রথমে রাস্তা কাটিয়া সমাজের উচ্চতর স্তরে প্রবেশপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। পার্লেমেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁহাদের সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রী থাকে, তাঁহাদেরই চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয়, ন চ বিদ্যা, ন পৌরুষং। অতএব মার্জ্জরী, তুমি ভাবিও না। দেখিয়াছ ত, বজ্রের দ্বারা হীরা চুনী পান্নায় বিঁধ করিলে, তাহার ভিতরে কোমল সূক্ষ্ম গাছটি প্রবেশ করিতে পারে, তেমনি এই বড় সাহেবগুলির পাষাণ হৃদয় তোমার শাণিতকটাক্ষের দ্বারা উৎকীর্ণ হইলে তন্মধ্যে আমার প্রবেশ সুসাধ্য হইয়া পড়িবে। এমনিতর অনেক সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ ও অনুনয়ের দ্বারা মিনি বশীভূত

হইলে, দিল্লীর শ্বেতাঙ্গ-সমাজে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল। ভবানন্দ ব্যাঙ্কের কার্য্যে প্রবীণ, বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিপ্রাপ্ত হইলেন এবং সেই সঙ্গে সকলেই বাহবা দিয়া বলিল, ভবানন্দের স্ত্রী সুন্দরী বটে।

বোম্বাইয়ের পরিচয় পত্র, বিলাতী সাজপরিচ্ছদ ও সুন্দরী স্ত্রী—এসকলের সমষ্টিগত প্রভাব ব্যর্থ হইতে পারে না। সুতরাং ভবানন্দের সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হইয়া আসিল। পরে একদিন সত্য সত্যই লাল পোযাকধারী চাপরাশী লম্বা খামে এক পত্র আনিয়া আরও লম্বা এক সেলাম করিল। পত্রে ভবানন্দকে একবৎসরের জন্য তিনশত টাকা বেতনে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের সংবাদ-দাতা বা রিপোর্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। খাস্তগীর সাহেব একটি আস্ত টাকা বখশিশ্ দিয়া ও চাপরাশীকে খুসী করিতে পারিলেন না!

৪

রেসিনায় যেখানে নূতন সহর হইয়া উঠিতেছে, তাহারই প্রান্তে গবর্ণমেণ্টের কয়েকটি বাংলো খালি পড়িয়া ছিল। দূরত্বের জন্য কেহ সেখানে যাইতে চাহিত না। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে রফা করিয়া খাস্তগীর দম্পতী সস্তায় তাহারই একটি বাংলো অধিকার করিলেন। বাংলোটি নূতন; আসবাবগুলি চক্চকে, পরদাগুলি চটকদার। সবই ভবানন্দের সাহেবী মেজাজের অনুকূল। সুতরাং আর কোনও অসুবিধাই রহিল না। বাড়ীর

নাম দেওয়া হইল "ফেয়ারী হল্"। ফেয়ারী হলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চায়ের পার্টি বসিত। সকল দিকে ব্যয় অসম্ভবরূপে কমাইয়া এই সকল আনন্দ-সম্মিলনের ব্যবস্থায় খাস্তগীর সাহেব মন দিলেন। ইহাতে প্রথম প্রথম দুই চারিটি দেশী মূর্ত্তি থাকিলেও ক্রমশঃ তাহা বিরল হইয়া উঠিল।

মার্জ্জরী রীতিমত মেম সাহেব সাজিয়া সাহেবমেমদিগকে আ-পরিতোষ চা-কেক্-স্যাণ্ডউইচাদি ভোজন করাইতে লাগিলেন। মুসলমান বাবুর্চ্চি ও যুবক খানসামা সাদা ধপধপে পায়জামা-চাপকান ও মনোগ্রাম যুক্ত পাগড়ীতে মণ্ডিত হইয়া টেবিলে খাদ্যাদি পরিবেশন করিয়া দিত। অনেক সময়ে নিমন্ত্রিতেরাও আবার খাস্তগীরদের নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিল।

কখনও কখনও ডিনারের নিমন্ত্রণে নাচের ব্যবস্থাও থাকিত। প্রথম প্রথম খাস্তগীরেরা কোনও না কোনও অজুহাতে সকাল সকাল ছুটি লইয়া আসিতেন। কিন্তু ভবানন্দের মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হইত না। কাজেই তিনি সাহেবিয়ানার এই শেষ বাধাটুকু নির্ম্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাট্ কোম্পানী হইতে মাসিক ৩৲ ভাড়ায় এক পুরাতন পিয়ানো আনিয়া উভয়ে নাচ শিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

শিখাইবার এক ওস্তাদও জুটিল—সে রেসিনার সেণ্ট মেরী গির্জ্জার গায়ক। তাহার গানে উপাসনা-নিরত খ্রীষ্টানগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। কিন্তু দিল্লীর মত স্থানে এবং অল্প খরচে ইহা অপেক্ষা ভাল শিক্ষক মেলা দুর্ঘট। বিশেষ গীতবাদ্য বিষয়ে

মিনির কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলেও, ভবানন্দ ছিলেন একেবারে নীরেট। সুতরাং খাস্তগীর পরিবারে অল্প দিনেই মিষ্টার পেরির যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইল।

মিষ্টার পেরীর সঙ্গীত-বিদ্যা সম্বন্ধে পারদর্শিতা যেমনই হউক, তাহার দ্বারা মিসেস্ খাস্তগীরের একটি মহৎ উপকার হইল। পেরীর বয়স পঞ্চাশের কোটায়; কিন্তু মার্জরীর রূপ ও গুণের প্রভাবে সে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, পিয়ানো ও নৃত্য শিখাইবার ব্যপদেশে সে প্রায়ই খাস্তগীর ভবনে বিরাজ করিত। তাহার প্রথম ফল হইল এই যে, বিলাতী সংস্কারগুলি ইহাদের আরও মজ্জাগত হইয়া পড়িল। আর একটি ফল হইল যে, পেরীর গতিবিধি যে পরিমাণে বাড়িয়া গেল, অপর বন্ধুগণের লোলুপ দৃষ্টি সেই পরিমাণে সংযত হইতে বাধ্য হইল। পেরী মিসেস্ খাস্তগীরের অভিভাবক স্বরূপ হইল এবং পেরীর সঙ্গেও মার্জরীর সম্বন্ধ অনেকটা স্নেহ ও সৌহার্দ্দের সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইল।

খাস্তগীর সাহেব আফিসে কাজ করেন, সাহেব উপরওয়ালার খোসমেজাজের জন্য প্রাণান্তিক চেষ্টা এবং দেশীয় অফিসারের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করেন। মার্জরীকে বিবি সাজাইয়া সাহেবমেম মহলে বাহির করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে মার্জরীরও যে উৎসাহ ছিল না, তাহা নহে। সে মেমের স্কুলে পড়িয়া, মেমদের সঙ্গে বেড়াইয়া মনে মনে মেম হইয়া উঠিয়াছিল বাল্যকালেই। স্বামীর সঙ্গে পড়িয়া, তাহাই

ঘসিয়া মাজিয়া বিলাতী সমাজের উপযুক্ত করিয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইল না।

যে সকল সাহেব তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হইত, তাহাদের প্রেম-নিবেদন যে তাহাকে স্পর্শ করিত না, তাহার কারণ সে হাজার হইলেও ব্রাহ্মণ-কন্যা। তাহার হিন্দুয়ানির তটভূমি নূতন ভাবের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তুলসীতলার সন্ধ্যা-প্রদীপের মত সাবিত্রীর আদর্শটুকু সে সমস্ত হৃদয়ের নিবিড় আচ্ছাদন দিয়া রক্ষা করিতেছিল। সেখানে তাহার স্বামীর অধিকারও মস্তক নত করিত। কখনও কোনওখানে নাচিতে গিয়া যদি সে দেখিতে পাইত, যে শিষ্টাচারের সীমা-লঙ্ঘন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে সে আর সেখানে কিছুতেই যাইতে চাহিত না— স্বামীর নিতান্ত অনুরোধেও না। তার এই মেমসাহেবী বেশ-বিন্যাসের মধ্য দিয়া একটুখানি কুসংস্কার যে কেমন করিয়া মাথা তুলিয়া সব ওলটপালট করিয়া দিত, তাহা ভবানন্দ কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না।

একদিন সে বড় ফাঁপরে পড়িল। ভবানন্দের চাকরীর এক-বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনশত হইতে একেবারে তাহার মাহিনা আটশত হইয়াছে। এখন আর সে শুধু রিপোর্টার নহে—সে একটা অফিসের কর্তা। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে সে গবর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতার পদ পাইয়াছে। অনেক বড় বড় সাহেবের বাড়ী হইতে তাহার নিমন্ত্রণ আসিতেছে। একদিন সেইরূপ এক

নিমন্ত্রণ আসিয়াছে লাটপ্রাসাদ হইতে। ভবানন্দ পাড়ার এক সাহেবের সহিত স্থির করিয়া আসিয়াছে যে, তাহারা সন্ধ্যায় সেই সাহেবের সঙ্গে তাহারই মোটরে লাট ভবনে যাইবে।

ভবানন্দ যখন সেই বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিল, তখন মার্জরী দীর্ঘ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পোষাক পরিতেছিল। সান্ধ্য পোষাকে শরীরের অধিকাংশই অনাবৃত থাকে। মার্জরীর সুমার্জ্জিতদেহে বিদ্যুতালোক পড়িয়া যেন ঠিকরাইয়া যাইতেছিল। ঘন কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের উপর একটি ছোট মোতির মালা দর্পণের মধ্যে যেন হাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার সে রূপের মোহে সে নিজেই আচ্ছন্ন হইতেছিল। এমন সময় ভবানন্দ সে ঘরে প্রবেশ করিল। তখন মার্জরী উচ্চগোড়ালীবিশিষ্ট জুতা পরিয়া নৃত্য-ভঙ্গী করিতে করিতে বেশ-বিন্যাস করিতেছিল। ভবানন্দ আয়নার দিকে চাহিয়াও কিছুই লক্ষ্য করিল না। সে কেবল সেই মোটরের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে।"

মার্জরী তাহার শুভ্র দশন-পংক্তির মধ্যে একবার অধরটি চাপিয়া আয়নায় ভবানন্দের মুখখানি দেখিতে লাগিল। দেখিল, সে মুখে একটুকুও ভাবান্তর নাই; একটুও আনন্দের ছায়া তাহাতে পড়িল না। মনে করিল, স্বামী বুঝি অন্যমনস্ক আছেন; তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "মোতির মালাটা কি আর একটু তুলে দেবো?"

"ওঃ মোতির মালা?—তা দিলে হয়।"

"দেখ ত, আমার জামার পিঠের বোতাম ছুটো বুঝি দেওয়া হয় নি!"

ভবানন্দ কাছে আসিল; খোলা বোতামের খোঁজ করিতে স্ত্রীর অনাবৃত পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল, মার্জরী আয়নার দিকে অতি নিবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিল, একটুও পুলক শিহরণ যদি ভবানন্দের অঙ্গে দেখিতে পায়! কিছুই সে দেখিতে পাইল না। তখন সে গ্রীবা বাঁকাইয়া ভবানন্দের মুখের অতি নিকটে মুখখানি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিল :—

"দেখ্‌তে পাওনি? আর একটু নীচে।"

ভবানন্দ সেই বোতামের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত হইল, একখানি মুখ যে ব্যাকুল অন্বেষণে তাহারই দিকে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার খোঁজ সে রাখিল না।

বোতাম লাগাইয়া ভবানন্দ বলিল, "মিষ্টার মার্টিন এখনই মোটর নিয়ে এসে পড়বেন। আমি প্রস্তুত হয়ে নি গে।"

মার্জরী বলিল "মার্টিন্ না হয়ে আর কারু সঙ্গে গেলে হ'ত না?"

"কেন, মার্টিন্ কি দোষ করলে? সে একদিন হয়ত কমার্স সেক্রেটারী হবে।"

এবারে মার্জরী একটু বিরক্ত হইল। সে বলিল, "তাতে কিছু আসবে যাবে না। তবে আমি তার সঙ্গে ভিতরে বস্‌তে পারবো না, বাপু।"

"কেন? তুমি না বস্‌লে কে বস্‌বে?"

"দেখ, ওর উচিত, আমাদের ভিতরে বস্‌তে দিয়ে নিজের বাইরে বসা! কিন্তু তা না করে' তোমায় যে বাইরে বসায়, এটা কোনও ভদ্রতা সম্মত নয়।"

"তা হ'লই বা! ওসব ছোটখাট্টো ব্যাপার নিয়ে মাথা-ঘামানো মেয়ে লোকেরই সাজে। কি আশ্চর্য্য!"

"ঠিক কথা! মেয়ে লোক বলেই মাথা ঘামাতে হয়। মেয়ে লোক অমন ভাবে একজন পুরুষ মানুষের পাশে বসে যেতে পারে না, বিশেষ সে যদি তোমার মত মেয়ে লোকের রূপ যৌবন সম্বন্ধে উদাসীন না হয়—"

"এ সব খেয়াল আবার তোমার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিলে, বল ত? বাঃ—একজন বড় দরের সাহেবের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে যাবে, এটা ত মস্ত সৌভাগ্যের কথা। ক'জন বাঙ্গালী মেয়ে এ গৌরব করতে পারে, ভেবে দেখ দেখি!"

"বেচারী বাঙ্গালী বামুনের মেয়ের পক্ষে বড় দরের সাহেবের অঙ্গ-স্পর্শ কি এতই দামী জিনিষ? মেমদের অঙ্গস্পর্শ লাভ করতে পারলে, তোমাদের পুরুষদেরও মনে বুঝি এমনি গৌরব বোধ হয়?"

"তুমি কি বল্‌ছ, তা আমি ভাল বুঝতে পারছি নে। এত-দিন এত উচ্চশিক্ষা লাভ করে', দেখ্‌ছি তুমি এখনও জাতবুলি ছাড়্‌তে পারনি। এত করে'ও, যে সব বাঙ্গালীমেয়েরা ঘরের কোণে পচে মরে, দেখ্‌ছি তুমি তাদেরই একজন। যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

"যে সব বাঙ্গালী মেয়েরা ঘরের কোণে পচে মরে এবং স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের অঙ্গস্পর্শ করে' কৃতার্থ হয় না, তাদের পায়ের ধূলো নেবার যোগ্যতাও আমাদের নেই।"

"এসব বাজে কথা শোনবার সময় নেই।" এই বলিয়া ভবানন্দ প্রস্থানোদ্যত হইল। মার্জরী চুলের কাঁটা অধরোষ্ঠে চাপিয়া আয়নায় খোঁপা ঠিক করিতেছিল। কাঁটাটি হাতে লইয়া বলিল—

"তোমার সময় না থাকৃতে পারে। আমি কিন্তু বলে রাখ্ছি তোমার মার্টিন্ সাহেবের সঙ্গে আমি গাড়ীর ভিতর বস্তে পারবো না।"

"কি আপদ! তা হলে' যে তাকে বড্ড অপমান করা হবে—"

"কেন? তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বস্লে, তার অপমান হতে যাবে কিসে?—"

"সে তুমি বুঝ্তে পারবে না! সে ত ভদ্রতার খাতিরে আমাকে ও তোমাকে গাড়ীর ভিতর বসিয়ে নিজে শোফেয়ারের পাশেই বস্তে চাইবে। কিন্তু আমারও ত উচিত, তার মর্য্যাদা রক্ষা করা। আমার ভদ্রতা হচ্চে যে, তোমাকে তার সঙ্গে দিয়ে, আমার বাইরে বসা।"

"তা হতে পারে! কিন্তু মার্টিন্ ত ভদ্র না হলেও পারে—"

"এ কথা তোমায় কে বল্লে? ঐ পেরী বুঝি তোমাকে বলেছে? পেরীর জন্যে ত দেখ্ছি কারও সঙ্গেই সদ্ভাব রক্ষা

করা চল্‌বে না! রাজ্যের খবর ঐ ব্যাটার কাছে। ওকে না তাড়াতে পারলে কিছু সুবিধে হবে না দেখ্‌ছি—"

"সে যা হয় করোগে তুমি। আমি কিন্তু বল্‌ছি যে মার্টিনের মত বদ্‌লোকের সঙ্গে অন্ধকারে এক গাড়ীতে পাশাপাশি বসে' যেতে আমি পারবো না,—পারবো না,—পারবো না।"

সেদিন সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও ভবানন্দ মার্টিনের সঙ্গে সৌজন্ত রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। খাস্তগীর যুগল সেদিন অত্যন্ত বিরসবদনে গাড়ীর ভিতরে অন্ধকারে বসিয়া রহিল। একটি-বারও পরস্পরের অঙ্গস্পর্শ ঘটিল না। মার্টিনও কথা কহিল না। ফলে এই হইল যে, রাত্রি ১টায় যখন লাটভবনে নৃত্যগীত শেষ হইল, তখন মার্টিনকে কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া ভবানন্দ সেই মাঘ মাসের নিশীথেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। তাহাকে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া মার্জরী হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই! মার্টিনের দয়ার অভাবে আমরা একেবারে মরে যাব না। বাইরে চল, সেখানে আমাদের জন্ম ট্যাক্‌সি অপেক্ষা করছে।"

ভবানন্দ একটু আশ্বস্ত হইল বটে; কিন্তু ট্যাক্‌সির যাতায়াতের ভাড়া অনর্থক বহন করিতে হইবে, এই জন্ম বিরক্ত হইয়া উঠিল।

"ফোণ করে আনিয়েছ বুঝি? কত লাগবে, একবার দেখে নিয়ো এখন!"

মার্জরী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যতই লাগুক, তবুও সস্তা।"

৫

সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মার্জরীর রূপের ছটা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। ছোট গাউন, গোলাপী ব্লাউজ, ও খড়ের নামানো টুপী পরিয়া এক হস্তে ব্লু রঙের ছাতা ও রূপার জালীর রুমালের ব্যাগ লইয়া সে যখন বেড়াইতে বাহির হয়, তখন কেহ তাহার দিকে একবার প্রশংসার দৃষ্টি না দিয়া যাইতে পারে না।

শিমলায় তাহারা বৎসরে একবার করিয়া গিয়া কয়েক মাস বাস করিত; তখন মার্জরী খাকী রঙের টাইট্ জ্যাকেট পরিয়া, পায়ে চর্ম্মের 'গেটার' আঁটিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া মাঝে মাঝে বাহির হইত; আর রাস্তার লোক অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। খাস্তগীর সাহেবও তাহার পাশে ঘোড়ায় থাকিতেন। শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের প্রশংসমান দৃষ্টিতে তিনি আপনাকে অতি সৌভাগ্যবান বলিয়া গণনা করিতেন!

এখন খাস্তগীরকে না চেনে, শিমলা বা দিল্লীতে এরূপ লোকের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গ অথবা দেশীয় সমাজে বড় বেশী ছিল না। তিন বৎসরে তাঁহার আশাতীত পদোন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি দু হাজার টাকা বেতনের অফিসার। গবর্মেণ্টের রাজস্ব বিভাগ তাঁহার পরামর্শ লইয়া সমস্ত আর্থিক সমস্যার সমাধান করে। শিমলায় 'ম্যালে'র কেন্দ্রভাগে, খাস্তগীরের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে কাষ্ঠ ফলকে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার অফিসের

মেজেয় সুচিক্কণ কার্পেট আস্তৃত। সমস্ত আসবাবের মধ্যে তাঁহার উচ্চপদের গরিমা মুদ্রিত রহিয়াছে। জানালার দিকে একখানি ছোট টেবিলের উপরে একটি টাইপরাইটারে, একজন ইংরেজ যুবতী বসিয়া শুভ্র ফুলস্ক্যাপে চিঠিপত্র সকল নকল করিতেছে। লাল উর্দিপরা চাপরাশীর দল সেগুলি লইয়া ঘরে ঘরে বিলি করিতে ছুটিতেছে।

মিষ্টার খাস্তগীর দিনের মধ্যে শতবার মিস্ প্যাজেট্‌কে ডাকিয়া নিজের সম্মুখে বসাইতেছেন। তিনি চিঠির মুশাবিদা মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছেন, আর মিস্ প্যাজেট্ তাহা রেখাক্ষরে টুকিয়া লইতেছেন। কখনও কখনও সাহেব যে হাঁ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন এবং মুশাবিদার সূত্র হারাইয়া ফেলেন, সেটা তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় বলিয়াই মেম সাহেব মনে করেন। কিন্তু স্বভাবচতুরা স্ত্রীজাতির কাছে লুকোচুরি বেশী দিন চলে না। খাস্তগীর সাহেবের চিন্তার সূত্রে যে অনেক সময়ে জড়াবটী বাঁধিয়া যায়, তাহা যে সেই কুন্দেন্দুতুষারধবলা বরাঙ্গিনীর হসিতাননের প্রভাবে, এ কথা বুঝিতে তাহার বড় অধিক সময় লাগিল না।

খাস্তগীর সাহেব তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্য এবং মিস্ প্যাজেটের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রচণ্ডভাবে দোল খাইতে লাগিলেন। ভাবিতেন, 'একদিন খোলসা করিয়া মিস্ প্যাজেটকে সব বলিব না কি?' আবার ভাবিতেন, 'শেষটা যদি 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়া যায়।' এই মনে করিয়া তিনি ধৈর্য্য

ধারণ করিতেন। তবে মধ্যাহ্নে একত্রে চা-পান ও অফিসের ফেরত কিয়দ্দূর মেম-সাহেবকে পৌঁছাইয়া দিয়া যতদূর আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহা খাস্তগীর সাহেব পূরামাত্রায় আদায় করিয়া লইবার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন।

শিমলায় অনেকে খাস্তগীরের সম্বন্ধে প্রকাশ্যেও ঈর্ষা করিতে ছাড়িত না। তিনি যে সদরে ও অন্দরে সর্ব্বত্র সমান ভাগ্যবান একথা সকলেই স্বীকার করিত। সুতরাং তাঁহার পশার প্রতিপত্তি হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল। কিন্তু মনে তাঁহার শান্তি ছিল না। এদিকে তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব কারণে অ-কারণে তাঁহার কামরায় আসিয়া সময় অপহরণ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে গৃহে মার্জরীও নানা প্রকার বিদ্রূপবাণে তাঁহাকে বিব্রত করিতে ছাড়িত না। ভবানন্দ কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি মিস্ প্যাজেটের একটু পক্ষপাতী হইলে মার্জরী কেন তাহাতে ঈর্ষায় জ্বলিয়া যাইবে! তাঁহার মতে স্ত্রী ও পুরুষের স্বাধীনতা থাকা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক; এবং তিনি বিলাত না গিয়াও বিলাতী সমাজ সম্বন্ধে যতদূর জানেন, তাহাতে সে সমাজে ঐ প্রকার স্বাধীনতা আছে নিশ্চয়।

তিনি মিস্ প্যাজেটের সঙ্গে মাস কয়েক ছুটী লইয়া বিলাত প্রবাস করিবেন, এমনই একটা কল্পনা মনে মনে রচনা করিতে-ছিলেন। একদিন বলিয়াই ফেলিলেন—

"মিস্ প্যাজেট, আমি বোধ হয় এবার গ্রীষ্মে বিলাত যা'ব। আমার এখানকার গরমটা তেমন সহ্য হয় না। তোমাদের ত আরও অসহ্য হ'বার কথা।"

মিস্ প্যাজেট্ একটু গ্রীবা বাঁকাইয়া, পেন্সিলটা তাহার চম্পকাঙ্গুলির মধ্যে দোলাইয়া বলিল—"আমার খুব গরম লাগে না এখানে। তবে বিলেত যেতে আমার খুব ভাল লাগে।"

সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট দীর্ঘশ্বাসও ফেলিল।

খাস্তগীর বলিলেন—"তোমার বাড়ী যেতে নিশ্চয়ই খুব আগ্রহ আছে—"

খাস্তগীরের বিশ্বাস ছিল যে মিস্ প্যাজেট্ সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছে। এইরূপ একটা কথা মেম সাহেব নিজেই প্রচার করিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল; সে তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া বলিল—

"হাঁ! বিলাতের সম্বন্ধ আমার একরূপ ফুরিয়েছে, এখন বিলাতের আশা মরীচিকা মাত্র।"

খাস্তগীর উৎসাহের সহিত বলিলেন, "কেন? যদি এমন কোনও সঙ্গী পাওয়া যায় যে কোনও কিছুরই জন্ম ভাবতে না হয়; কেবল জাহাজে উঠে বসা মাত্র প্রয়োজন হবে—"

উত্তরের জন্ম তাঁহার যে উৎকণ্ঠা তাহা প্রচ্ছন্ন রহিল না। মিস্ প্যাজেট্ জানালার বাহিরে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর কণ্ঠ ঈষৎ কাঁপাইয়া বলিল—

"অশেষ ধন্যবাদ, মিষ্টার খাস্তগীর। আপনার সঙ্গে বিলাত

যেতে পারবার সৌভাগ্য কি আমার হবে! আপনার দয়া ভুলতে পারব না। ভারতীয় লোকদের মধ্যে আপনার মত দয়ালু যে থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না।"

এই সকল উচ্চ প্রশংসায় খাস্তগীর সাহেব পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দয়ার উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীমতীর অশ্রু উথলিয়া উঠিল। ভবানন্দ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। মেম সাহেবের চোখে জল! এরূপ ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইল!—তিনি দ্রুতগতিতে মেমের চেয়ারের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যদি হঠাৎ মূর্চ্ছা হয় কি কিছু হয়, তবে সযত্নে বাহুবেষ্টনে তাহাকে সামাল করিবেন, সেই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় তিনি চেয়ারের পশ্চাৎভাগ সজোরে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু হতভাগ্য চাপরাশীরাও ঠিক সেই মূল্যবান মিনিট কয়েকের মধ্যে কেন যে পুনঃ পুনঃ ঘরে ঢুকিয়া ফাইল দিয়া ও নিয়া যাইতে লাগিল, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না!

পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীভূত পাপরাশির মত ফাইলগুলি টেবিলের উপর জমিতে লাগিল। ফলে তাঁহার আশাকুসুমকলিকা চাপরাশীদিগের অনবরত প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটিত ঝঞ্ঝাবাতে ঝরিয়া খসিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি যে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সে সময়টাও নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। তিনি তদবস্থায় জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, মিস্ প্যাজেট যেন কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইয়া তাঁহার স্কন্ধে

ঢলিয়া পড়িয়াছে, আর তিনি ঘন ঘন চুম্বনের দ্বারা তাহার অশ্রুবিন্দু সকল শুষিয়া লইতেছেন। বস্তুতঃ তাহার চন্দ্রকিরণসন্নিভ কচকলাপ হইতে কেতকী ও জেসমিনের মিশ্রিত সুগন্ধ খাস্তগীর সাহেব শ্বাসে শ্বাসে অনুভব করিতেছিলেন।

ইহার পরে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, মিস্ প্যাজেট তাঁহার প্রতি অতি সুপ্রসন্না। সেদিন চারিটা না বাজিতেই যখন মিসেস্ খাস্তগীর ঘোড়ার পৃষ্ঠে জিন্ কষিয়া আফিসে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে দেরাজের চাবি চাপরাশীর গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া স্ত্রীর অনুবর্ত্তন করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মন-ভ্রমর সেই টাইপিষ্ট ললনার টেবিলখানি ঘেরিয়া ঘেরিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল।

পরদিন আফিস হইতে ফিরিয়া হ্যামিল্টন কোম্পানীর নিকট হইতে মিস্ প্যাজেট্ একটি সুদৃশ্য মখমলের কেসের মধ্যে একছড়া মুক্তার মালা পাইল। বুঝিল, কোথা হইতে এই মূল্যবান উপহার! এই প্রথম প্রণয়োপহার পাঠাইয়া খাস্তগীর সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন; কিন্তু তাহা কেহ দেখিল না। ক্রমশঃ এই প্রেম নাটিকার প্লট্টি জমাট বাঁধিয়া আসিল।

৬

খাস্তগীর দম্পতীর সাজসজ্জাবহুল ঘরকন্নার মধ্যে এতদিন প্রণয় জিনিষটি নিতান্ত অনাবশ্যক বিলাসিতার মধ্যে গণিত হইলেও আজকাল একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। খাস্তগীর সাহেবের

পোষাক পরিচ্ছদের চটক্ যেমন দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল, তেমনি স্ত্রীর প্রতিও টানটা হঠাৎ কিছু অতিমাত্রায় দেখা দিল।

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইবার সময় খাস্তগীর দেখিলেন মার্জরীও সজ্জিত হইয়া আসিল। তখন সাহেবের দৃষ্টি ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চালিত হইতেছে, মনের গোপন কোণে একটি আনন্দের ফোয়ারা খেলিতেছে, সুচিক্কণ কোটের বোতামে অর্কিডের গুচ্ছ দুলিতেছে,—মার্জরী সংশয়াকুল-মনে বারান্দার এক পাশে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। অন্য সময় হইলে খাস্তগীর জরুরী কাজের দোহাই দিয়া অল্প কথায় বিদায় লইতেন। কিন্তু আজ তিনি বড়ই খোস মেজাজে বাহিরে যাইতেছেন। সুতরাং মার্জরীর অতি নিকটে আসিয়া এক হস্তে ছড়িগাছটি ও টুপী উঁচু করিয়া ধরিয়া, শরীর একদিকে অনেকটা হেলাইয়া, যে হাত মুক্ত ছিল সেই হাতে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া ফেলিলেন। শার্ট পাছে একটুও কুঞ্চিত হয়, এই ভয়ে আলিঙ্গনটি অবশ্য অর্দ্ধপথে থমকিয়া গেল!

"আজ আমাকে একলাই যেতে হচ্চে, ডিয়ার।"

মার্জরী ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে একটুও না কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—

"আমাকেও যে বেরুতে হবে, ডার্লিং। তুমি কোন্ দিকে যাবে?"

খাস্তগীর বলিলেনঃ—"আমি এই ইয়ে—বার্ণস্ কোর্টের দিকে

যাচ্ছি। তুমিও কি ঐ দিকে যাবে?" এই বলিয়া তিনি হাত-ঘড়ির দিকে অতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেন।

মার্জরী শুধু বলিল—"না।"

খাস্তগীর খাঁ করিয়া তাহার গালে একটি ছোট্ট টিপ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মার্জরী মনে করিল, মন্দের ভালো। এ প্রকার আদর সম্ভাষণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেণ্টাকী গ্রোভে বড় একটা দেখা যায় নাই।

খাস্তগীর সবেগে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং মনের উল্লাসে বে-সুরো শিস্ দিতে দিতে ফটকের বাহির হইয়া গেলেন। মার্জরী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল।

মার্জরী সত্যই বার্ণস্ কোর্টের বিপরীত দিকে চলিল। তাহার পা আর চলে না। সংশয়ের চাকায় তাহার মন ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। একদিকে স্বামীর প্রণয়াভিনয়, অন্যদিকে ঘনায়মান সন্দেহ—বেচারী কোনও কুল কিনারা করিতে পারিতেছিল না।

পেরী সম্প্রতি শিমলায় আসিয়াছে। আজ এই বিপদের দিনে পেরীর নিকটে তাহার নিরাশ্রয় মন পরামর্শের জন্য ধাবিত হইল। পেরী 'প্রস্পেক্ট' পাহাড়ের নীচে একটি বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে—মার্জরী সে বাড়ী চিনিত। সে কার্ট রোড ধরিয়া অনেকটা পথ ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। একটা বাড়ীর দোতলায় পেরী থাকে। দরজায় আঘাত করিতেই পেরী ভিতর হইতে "এস" বলিয়া সাড়া দিল। মার্জরী তবুও

বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। পেরী অবিবাহিত। একেবারে তাহার ঘরের ভিতর যাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতেছিল। অবিবাহিত লোকের বাড়ীতে একজন ভদ্রমহিলার এমনভাবে আসাই অন্যায়; নিতান্ত প্রাণের দায়েই সে আজ আসিয়াছে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতে তাহার পা আর চলিল না। পেরী কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "ওঃ তুমি।"

পেরীও বিব্রত হইল; সে মার্জরীকে সত্য সত্যই ভালবাসিত;—তাহার অসহায় অবস্থা সে বুঝিল। স্নেহের সহিত তাহার কর নিপীড়ন করিয়া সে বারান্দায় রেলিংএর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রস্পেক্ট পাহাড়ের অপর পারে রবি ডুবিয়াছে, কিন্তু অস্তাচলের মেঘরাজি তখনও আলোর ঘটা করিয়া রহিয়াছে। রেলিংএ ভর দিয়া, বাষ্পাকুলনয়নে মার্জরী এই প্রবীণ, বলিষ্ঠ অথচ স্নেহ-কোমল, বন্ধুর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিল। পেরী ভাবিতে লাগিল।

পেরী যে বাড়ীতে বাস করে তাহার নিম্নের তলায় কে থাকে, তাহা মার্জরী জানিত না। নীচের তলার প্রবেশ পথ স্বতন্ত্র, সুতরাং পেরীও সে সম্বন্ধে কোনও খবর রাখিত কি না, সন্দেহ। একজন মহিলা নীচের তলা অধিকার করিয়া আছে, এই পর্য্যন্তই সে জানিত। দোতলার নীচেয় একটুখানি ফাঁকা যায়গা; তাহাতে গোটা কতক ফুলের টব সাজানো আছে। তাহারা উভয়ে সেই দিকেই চাহিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

হঠাৎ তাহারা চমকিয়া উঠিল। দেখিল, একজন ইংরেজ মহিলার সহিত খাস্তগীর সেই ফুলবাগানে আসিয়া দাঁড়াইল। মার্জরী রেলিং থেকে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। খাস্তগীর উপরের দিকে চাহিলেই সে মার্জরী ও পেরীকে দেখিতে পাইত। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। মার্জরী দেখিল, মিস্ প্যাজেটের নিকট বিদায় লইয়া খাস্তগীর চলিয়া গেল। মিস্ প্যাজেট তাহার নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ভাবিল, এও মন্দের ভালো।

আর অপেক্ষা না করিয়া সে পেরীর নিকট বিদায় লইল। পেরীও কোট ও টুপী লইয়া মিস্ প্যাজেটের সঙ্গে আলাপ করিতে গেল।

খাস্তগীর ক্রমেই মিস্ প্যাজেটের সঙ্গ-লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মিস্ প্যাজেট্ যে তাঁহাকে সেরূপ ভাবে চাহে, এমনটা তাহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পায় না। খাস্তগীর নূতন নূতন উপহারে তাহাকে পূজা করিতে লাগিলেন ও নিভৃতে তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি ম্যালের উপর একটি ছোট হোটেল আবিষ্কার করিয়া তাহাকে সেখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন। ডিনারের পর বায়োস্কোপে গিয়া উভয়ে কাছাকাছি বসিয়া সেই আধ আলো আধ আঁধারে যতদূর সম্ভব তাঁহার প্রেম নিবেদন করিবেন, স্থির করিলেন।

পেরী এক সপ্তাহের জন্য শিমলায় আসিয়াছিল। মার্জরীর জন্য

বাধ্য হইয়া তাহাকে আরও এক সপ্তাহ থাকিয়া যাইতে হইল। প্রতিদিন সে কেণ্টাকী গ্রোভে আসে এবং সহানুভূতির দ্বারা মার্জরীর মনের দুঃখ লাঘব করিয়া দিবার চেষ্টা করে।

যেদিন মিস্ প্যাজেট্‌কে খাস্তগীর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সে দিন তিনি অফিস হইতে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, পেরী পিয়ানো বাজাইতেছে, আর মার্জরী দেশী শাড়ী ও ওড়না পরিয়া হাত নাচাইয়া বাইজির ঢঙ্গে নৃত্য অভ্যাস করিতেছে। খাস্তগীর তাহা দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন। সাহেব বাজাইতেছে পিয়ানোয় ইংরাজি গৎ, আর নিখুঁত মেম সাহেব মার্জরী শাড়ী পরিয়া তাহার সঙ্গে নাচিতেছে ও গাহিতেছে বিলাতী গান। তিনি কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

হঠাৎ মার্জরীর তালভঙ্গ হইল। পিয়ানো বেসুরো হইয়া গেল। পেরী মাথা চুলকাইতে লাগিল। খাস্তগীর তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—

"ওঃ কি চমৎকার। এবার যখন ডিনার দেবো, তখন তোমাকেও শিমলায় আস্‌তে হবে পেরী। এই পরীর নাচ সাহেবদের দেখাতে হবে। ওঃ কি মজাই হবে।"

মার্জরীর মুখখানি একটু মলিন হইল। সে বলিল—"উঃ পরী ত কত? পরী যদি কোথায়ও থাকে তবে মেম সাহেবদের মধ্যেই আছে, কি বল পেরী?"

খাস্তগীর দৃঢ়তার সহিত বলিল,—"এ কথা আমি স্বীকার করি না। একথা আমি কখনও স্বীকার করব না। আমাদের

জাতের মধ্যেও সুন্দরী আছে এবং সেরূপ একজন সুন্দরী লাভ করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, কি বল, পেরী?"

পেরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না। সে কেবল বলিল—"এই দেশী পোষাক আপনার স্ত্রীকে বেশ মানায় দেখেছেন, মিষ্টার খাস্তগীর। এমনটি আমাদের পোষাকে কখনও মানায় কি?"

সে কথার জবাব না দিয়া, খাস্তগীর উর্দ্ধশ্বাসে সে ঘর হইতে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহার যে অভিসারে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে! মার্জরী মলিন মুখেও একটু হাসিল।

৭

সে দিন বায়োস্কোপে বড় ভিড় হইয়াছিল। রাত্রি ৯৷৷০ টার সময় খাস্তগীর 'গেইটি' থিয়েটারে মিস্ প্যাজেটকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে 'ড্রেস সারকেলে' আগে হইতে একটি বক্স্ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা 'ওভারকোট' চেয়ারের পশ্চাতে রাখিয়া উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলেন। একখানি ব্যঙ্গ নাটিকার রঙ্গচিত্র প্রদর্শিত হইতেছিল। নূতন কোম্পানী শিমলায় গিয়া গেইটি রঙ্গমঞ্চে এই নূতন অভিনয় দেখাইতেছে। সেই জন্যই এত ভিড় হইয়াছে। কোথায়ও আর স্থান খালি নাই।

খাস্তগীরের মন অভিনয়ের দিকে ছিল না, কিন্তু মিস্ প্যাজেট্ একান্ত অভিনিবেশ সহকারে প্লে দেখিতেছেন। আর মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বাহবা দিতেছেন। সুতরাং খাস্তগীর তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিবার অবসর পাইতেছিলেন না।

মাঝে মাঝে তাঁহার কম্পিত কর মিস্ প্যাজেটের হস্তের অনুসন্ধান করিতেছিল।

একবার হঠাৎ বায়োস্কোপের আলো নিভিয়া গেল এবং প্রায় তিন মিনিটের পূর্ব্বে আর জ্বলিল না। খাস্তগীর বুঝিলেন, এই তাঁহার সুযোগ। তাঁহার বক্ষস্থল দুরু দুরু করিতেছিল, ওষ্ঠ এমত শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতেছিল, যে মাঝে মাঝে জিহ্বার দ্বারায় তাহা ভিজাইয়া লওয়া আবশ্যক হইল। ইহাতে যে কিছু সময়ের অপচয় হইল, তাহাতে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই আলো জ্বলিয়া উঠার সম্ভাবনা ছিল। তিনি দুই হাজার টাকা বেতনের একজন প্রধান অফিসার; তাঁহার এত ভয়ই বা কিসের? এইরূপে মনকে সাহস দিয়া, তিনি হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেমন মিস্ প্যাজেটের বদনে একটি নিবিড় চুম্বন দিবেন, অমনি আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং ভয়েও বিস্ময়ে খাস্তগীর দেখিলেন, মিস্ প্যাজেটের স্থলে ওড়নায় আবৃত মার্জ্জরী বসিয়া আছে। অর্দ্ধপথে চুম্বন স্থগিত হইল।

মার্জ্জরী হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং খাস্তগীরও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নিম্নতলে আলোর স্বইচ্-বোর্ডের নিকটে পেরী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল।

নন্-কো-অপারেটার

১

"এতক্ষণে বাড়ী ফেরবার কথা মনে প'ল ?"

পিসিমা শেলাই রাখিয়া নাসাগ্রে স্থাপিত চশমার উপর দিয়া তাকাইয়া রহিলেন—

ভ্রাতুষ্পুত্রী নাচিতে নাচিতে আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—

"আজ কিন্তু বক্‌তে পাবে না। তাই বল।"

"আচ্ছা কোথা ছিলি, আগে বল্।"

"যদি না বলি ?"—

"তা'হলে বকুনি খেতে হবে।"

"আচ্ছা, কি রকম বকুনি শুনি আগে। বোকা মেয়ে, থুবড়ো মেয়ে—এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে বাইরে থাকা—কোনও ভদ্দর ঘরের মেয়ে—"

পিসিমা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—

"না, তোর সঙ্গে আর পারিনে, ইরা।"

ইরাণী পিসিমার গলা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—

"রাখীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তার বর এসেছে আজ সকালে। তাস খেল্‌তে বসে রাত হয়ে গেল। বকবে না ?—"

রাখী ইরাণীর বাল্যসখী। পিসিমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় শেলাইয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ইরাণী তাহা লক্ষ্য করিল। সেও পিসিমার অনুকরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া বলিল,—

"বর আস্‌বে কবে, তাই ভাবছি!"

ইরাণী এমন অভিনয় করিয়া বলিল যে, পিসিমাও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

"দূর হ' পাগলী। তোর সব তাতেই ঠাট্টা; কবে যে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে, তার ঠিক নেই।"

"আচ্ছা পিসি সত্যি বল, তুমি ঐ কথা ভাবছিলে কি না?"—

"ভাবছিলাম সে আমার যা মনে লয়। তোর কি?'

ইরাণী দেয়ালের বড় আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুতালোক আরসীতে প্রতিফলিত হইয়া রূপ যেন ঝলমলিয়া উঠিল। ইরাণী রেশমী রুমালের দুইপ্রান্ত উভয় হস্তের অঙ্গুলিতে সযত্নে জড়াইয়া অধরের দুইপ্রান্ত ভাল করিয়া মুছিয়া আবার আরসীর দিকে চাহিল। চোখ যেন আর ফিরে না। ইরাণীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ ভাবনার ছায়া পড়িয়া মিলাইয়া গেল—যেন স্বচ্ছ নদীর চপল ঢেউএর উপর দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল।

"রাখী আমার চেয়ে ফরসা নয়,—না পিসি?"

পিসিমা আরসীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে হাস্যোজ্জল মূর্ত্তি দেখিয়া পিসিমা কিছুক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। কোনও কথা বলিলেন না!

ইরাণী সহসা হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া অন্যঘরে চলিয়া গেল। পিসিমা ভাবিতে লাগিলেন।

২

ইরাণী এলাহাবাদের সুবিখ্যাত উকীল রাজা কিষণপ্রসাদের কন্যা। কিষণপ্রসাদ ওকালতী ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক জমিদারীও কম ছিল না। বিখ্যাত 'নাভা-পাতিয়ালা' মোকদ্দমায় একপক্ষে থাকিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি রাজা খেতাব পাইয়া বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বেই ওকালতী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। একমাত্র কন্যা ইরাণীকে রাখিয়া তিনি একদিন বিদায় লইলেন। সংসারে রহিল এক দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী। ইরাণীর বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর।

কিষণপ্রসাদের জ্ঞাতিরাও ছিল; কিন্তু তাহাদের উপর তিনি তাঁহার কন্যা ও জমিদারীর ভার অর্পণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী তিন চার বৎসর পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং মৃত্যুকালে তিনি কন্যাকে বড়ই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া গেলেন।

তাঁহার উইল দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল।—তিনি তাঁহার অল্পবয়স্ক প্রতিবেশীর উপর বিষয়ের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। লোকের বিস্ময়ের কারণ এই যে, কিষণপ্রসাদের সহিত এই প্রতিবেশী যুবকের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না বলিয়াই

লোকে জানিত। মোহনলাল যখন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিল, তখন এই কিষণপ্রসাদই তাহাকে ব্যবসায়ে দাঁড় করাইবার জন্য সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু মোহনলাল হাইকোর্টে বাহির হইতে না হইতে দেশে নন্-কো-অপারেশানের ধুম পড়িয়া গেল। মোহনলালও আদালতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। দেশের আহ্বান সকলেই শুনিল, কিন্তু কেহ সাড়া দিল, কেহ দিল না। যাহারা সাড়া দিল, তাহারা অতীতের মমতা রাখিল না, ভবিষ্যতেরও প্রত্যাশা করিল না; শুধু কর্ত্তব্যের এক ডাকে, তাহারা নিমেষের মধ্যে সমস্ত ছাড়িয়া প্রস্তুত হইল। তাহাদের মধ্যে মোহনলাল একজন। মোহনলাল দেশে ফিরিয়া সাহেবিয়ানার কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই; কিন্তু দেশের ডাকে সে আদালত ছাড়িয়া খদ্দর ধরিল এবং একদিন তাহার বাক্স বোঝাই হ্যাটকোট-নেকটাই-কলার সন্ধ্যাবেলায় যমুনার কূলে জড়ো করিয়া আগুন লাগাইয়া দিল।

কিষণপ্রসাদ একদিন তাহাকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। অনাহারকে যে উপেক্ষা করিতে পারে, জেলখানাকে যে উপহাস করে, মরণকে যে ডরে না, তাহাকে স্বার্থের যুক্তিতর্কজাল বুনিয়া ধরিতে পারা যাইবে কেন? মোহনলাল টলিল না, বরং সে তাঁহাকে কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া গেল; সারাজীবন 'খয়ের খাঁ' গিরি করিয়া যে তিনি রাজটীকা পুরস্কার পাইয়াছেন, একথাও বলিতে ভুলিল না।

এই ঘটনার পর হইতেই কিষণপ্রসাদ যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, একবারও মোহনলালকে তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন নাই। লোকে জানিত যে, তিনি মোহনলালের উপর চটিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হঠাৎ যখন সকলে দেখিল যে কিষণপ্রসাদের বিপুল এষ্টেটের একজিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছে মোহনলাল, তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

মোহনলালও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কতখানি শ্রদ্ধা ও নির্ভর থাকিলে, এইরূপ বিপুল সম্পত্তির ভার একজনের হস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা ভাবিয়া মোহনলাল গৌরব বোধ করিল। তিনি যে নন্‌-কো-অপারেশানের পূর্ব্বে মোহনলালকে ব্যবসায়ে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সে ভুলিয়া যায় নাই। সুতরাং এই গুরুভার সে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, কৃতজ্ঞতার খাতিরে গ্রহণ না করিয়া পারিল না। কিন্তু সে মনে মনে স্থির সংকল্প করিল যে নিজের জন্য একটী পয়সাও ন্যস্ত সম্পত্তি হইতে সে লইবে না। মোহনলালের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু সে যখন হেলায় নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, তখন সে পরের অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না।

৩

রাজা কিষণপ্রসাদ কতকটা সেকালের লোকের মত ছিলেন। কন্যাকে পণ্ডিতের দ্বারা কিছু কিছু সংস্কৃত ও মুন্সীর দ্বারা উর্দ্দু লেখা পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াই তিনি তাঁহার

কর্ত্তব্যের শেষ করিয়াছিলেন। মোহনলাল বিলাতী শিক্ষার পক্ষপাতী, কাজেই নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। পুরাতন কর্ম্মচারীরা চক্ষু কপালে তুলিয়া, বারম্বার গুম্ফ পাকাইয়া, পরস্পর জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টির বিনিময় করিল। খদ্দরে মণ্ডিত, গান্ধিটুপী-ভূষিত, স্বদেশী-গন্ধ-মোদিত এই যুবকের মধ্যে পূরা দস্তর সাহেবিয়ানার ভাব দেখিয়া তাহাদের তাজ্জব লাগিয়া গেল! মোহনলাল রাজকুমারীর জন্য একটি মেম নিযুক্ত করিল। সে ইংরাজী শিখাইত, সেলাই ও গান শিখাইত এবং ইরাণীর সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন্, টেনিস্ প্রভৃতি ইংরাজী খেলা খেলিত! পিসিমা এই বন্দোবস্ত খুব পছন্দ করিতেন এবং নিয়ত মেম সাহেবের কাছে বসিয়া সেলাইটিও তিনি কতক আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেজন্যও বটে, স্বভাবের গুণেও বটে, তিনি একেবারেই মোহনলালের ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কর্ম্মচারীরা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, সূক্ষ্ম বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ কিষণপ্রসাদের অবর্ত্তমানে এই অপরিপক্ক তরুণ মনিবকে করায়ত্ত করা অতি সহজ হইবে। কিন্তু তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে, যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার স্বার্থের কামনা বর্জ্জন করিয়া শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আঁটিয়া উঠা কঠিন। কিষণপ্রসাদের উইলে মোহনলালের জন্য পারিশ্রমিকের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহার পদ ও মেহনতের হিসাবে উপযুক্ত মাসোহারা লইতে পারিবেন এরূপ নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু কর্ম্মচারীরা দেখিল, যে

এই নব্য অভিভাবকের দৃষ্টি অর্থের দিকে একেবারেই নাই। মাসের পর মাস সে খাটিয়া যায়, একটি কপর্দ্দকও নিজের জন্য লয় না।

যাহারা কিষণপ্রসাদের সম্পত্তির অভিভাবক হইলেও হইতে পারিত, তাহারা যখন দেখিল যে, এই ছোকরা পয়সা না লইয়াই এত বড় একটা জমিদারীর কাজ চালাইতেছে তখন তাহারা ভাবিল, বোধ হয় কিষণপ্রসাদের কন্যার প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে এবং তার সঙ্গে তাহার রাজ্যটিও যৌতুক পাইবার সে আশা রাখে; প্রকাশ্যেও তাহারা এ কথা বলিতে ক্রুটী করিল না।

কিন্তু মোহনলাল সে বালিকার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিত না। প্রয়োজন হইলে সে অবাধে অন্দর মহলে যাতায়াত করিতে পারিত; কেন না, এই পল্লীতেই সে ছেলেবেলা হইতে বাস করিতেছে। ইরাণীর সহিত বিশেষ দেখাশুনা না থাকিলেও, তাহার পিসিমা মোহনলালকে বাল্যকাল হইতেই জানিতেন। তাহা হইলেও সে অন্দরে বড় আসিত না। কোনও প্রয়োজন হইলে, কর্ম্মচারীর দ্বারা পিসিমাকে সংবাদ পাঠাইত, এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিত। কিন্তু এরূপ প্রয়োজন সে বড় একটা ঘটিতে দিত না। বাহিরের অফিস ঘরে বসিয়াই সে বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া চলিয়া যাইত।

ইরাণীর কোনও প্রয়োজন হইলে সে লালাজীর নিকটে পিসিমার দ্বারাই বলিয়া পাঠাইত। সে তাহার নিজের

খেলাধূলা, লেখা-পড়া লইয়াই থাকিত। লালাজীর নিকট কোনও প্রয়োজন জানাইতে সে বড় লজ্জা বোধ করিত।

৪

এই ভাবে প্রায় চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মোহনলাল সকালে সন্ধ্যায় রাজ-এষ্টেটের কাজ করে; দিনের বেলা জাতীয় বিদ্যালয়ে ঘণ্টা কতক পড়াইয়া যাহা কিছু পায়. তাহার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সংসারে তাহার মা ও একটি অবিবাহিতা ভগ্নী ব্যতীত আর কেহ নাই; কাজেই অল্প আয়ে একরূপ চলিয়া যাইত। ইচ্ছা করিলে যে মোহনলাল আইন ব্যবসায়েও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত, তাহা অনেকে খুব জোর করিয়া বলিত। কিন্তু মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুনয়েও সে বিদেশীর আদালতে যাইতে স্বীকার করিল না। যদি কখনও স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, দেশীয় ধর্ম্মাধিকরণ হয়, তখন দেখা যাইবে। সেরূপ কোনও শুভদিনের আগমনের আশু সম্ভাবনা মোহনলালের মাতা না দেখিলেও, মোহনলাল প্রাণপণে বিশ্বাস করিত। সে কথা উঠিলে ঈষৎ হাসিয়া শুধু ইহাই জানাইয়া দিত যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নাই। যাহা হউক, মোহনলাল মাতার আশা চরিতার্থ করিতে কোনরূপেই প্রস্তুত হইল না।

আর একটি বিষয়ে সে মাতার মতে সায় দিতে পারে নাই। দেশের সেবা করিতে হইলে যে অবিবাহিত থাকিতে হয়,

ইহা তাহার মাতা কোনও মতেই বুঝিতে চাহিতেন না। কিন্তু মোহনলালের অবস্থার কথা মনে করিয়া তিনি চুপ করিয়া যাইতেন। পুত্র যে দেশের জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতেন। এই অবস্থার মধ্যে বধূ ঘরে আনিয়া তাহাকে এবং ভবিষ্যতে তাহার যে সকল সন্তান হইবে, তাহাদিগের উপযুক্ত ভাবে ভরণপোষণ করিবে কি প্রকারে? চরকা কাটিয়া নিজের জীবিকা সংগ্রহ করিতে কোনও পুত্র-বধূকে প্রাণ ধরিয়া বলা যায় না। মোহনলাল অবিবাহিতই রহিল। স্বদেশ-সেবাব্রতধারী হেলায় যৌবনের জল-তরঙ্গ পার হইয়া গেল। বিশ্ব যে তাহার চির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-সম্ভার লইয়া তাহার হৃদয়দ্বারে কবে উপস্থিত হইল, কবে যে নবপুষ্পপল্লবে, বর্ণে, সঙ্গীতে ধরা ভরপুর হইয়া উঠিল, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াও করিল না।

রাজবাড়ীতে দপ্তরখানায় যখন সে কাগজপত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিত, তখন তাহার নিকটে যাইতে প্রবীণ কর্ম্মচারীরাও সাহস করিত না। সে একে একে যখন প্রধান আমলাদিগকে ডাকিয়া কাজের নিকাশ লইত, তখনই তাহারা আবশ্যকমত সমস্ত বিষয় পেশ করিয়া লইত। নিতান্ত আপত্তিকর না হইলে, সে কোনও কাজে বড় একটা প্রতিবাদ করিত না। বিলাতী কাপড় সম্বন্ধেই সে মঞ্জুরী দিতে কেমন কুণ্ঠিত হইত; অন্য কোনও খরচপত্রের সম্বন্ধে কেবল অমিতব্যয়িতা নিবারণ করিয়াই সে ক্ষান্ত হইত।

একদিন দেওয়ানজী বলিলেন যে রাজকুমারী কতকগুলি লেসের পরদার ফরমাস দিয়াছেন। তাহার দাম দিতে হইবে। মোহনলাল বিষম বিপদে পড়িল; বিলাতী লেসের পরদা তাহাকে না বলিয়া কে ফরমাস দিল? এখন তাহা মঞ্জুর করিবে কে? মোহনলালের মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া প্রবীণ কর্ম্মচারী আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু এ সংবাদ ইরাণীর পাইতে বিলম্ব হইল না। পরদা তখন কেনা হইয়া গিয়াছে; আর ত ফিরাইবার উপায় নাই। আর ফিরাইবেই বা কেন? সে ত আর বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় নাই। তাহার পিতার অর্থ সে ব্যয় করিবে, তাহাতে অন্যের কি আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা সে বুঝিল না।

তবে ইহাও ঠিক যে, মোহনলাল এ সংসারের তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিলে, ইহা একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, বিলাতী বস্ত্র এ বাড়ীতে আর চলিবে না। ইরাণীও বরাবর সেই ব্যবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু এখন সে বড় হইয়াছে, দু'চার জন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিতে হইতেছে। কাজেই ড্রয়িংরুম একটু না সাজাইলে ভাল দেখায় কি? রাজা কিরণপ্রসাদের আমলের যে ক্রেটনের পরদা ছিল, তাহার রং জ্বলিয়া গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ইরাণী নিজেই দরজি ডাকিয়া লেস্ কার্টেনের ফরমাস দিয়াছিল। ইহাতে এমন কি অন্যায় হইতে পারে? সে স্থির করিল এক দিন দাদাজীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিবে।

৫

ইরাণী যেদিন রাত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল, সে রাত্রিতে তাহার ভাল ঘুম হইল না। পিতার মৃত্যুর পর হইতে একদিনও সে কোনও বিশেষ চিন্তার মধ্যে পতিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত কোনও দিন কোনও অভাব তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। অভাব উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও বিষয়েই তাহাকে ভাবিতে হয় না। আজ তাহার মনে হইল যেন চিন্তা-রাজ্যের দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল; কোথা হইতে চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া স্রোতের মত তাহার মনকে কেবলই দোলা দিতে লাগিল! পূর্ব্বে তাহার মনে হইত জীবনে কোনও অভাব নাই; এমনি করিয়া হাসিয়া খেলিয়া পাল তুলিয়া নাচিতে নাচিতে জীবনের তরীখানি ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু আজ এ কি হইল? কি যে বিরাট অভাব তাহার সম্মুখে অনন্ত ক্ষুধা লইয়া উপস্থিত হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কেবল মনে হইতে লাগিল, তাহার জীবন শূন্য—শূন্য, সব শূন্য। রাখী কত সুখী!—রাখীই সুখী। রাখী এলাহাবাদের ধনী উকীল জগৎ নারায়ণের কন্যা, ইরাণীর সমবয়সী, উভয়েরই বয়স ১৭ বৎসর। বাল্যকাল হইতেই উভয়ের খুব ভাব, অনেক বিষয়েই তাহাদের মধ্যে সমতা ছিল। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে রাখীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সে শ্বশুর গৃহে গিয়াছিল। সম্প্রতি স্বামীকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদ ফিরিয়াছে।

আজ সে তাস খেলিতে বসিয়া দেখিয়াছে, রাখীর স্বামী রমাশঙ্কর রাখীকে কত ভালবাসে! সে নানা ছলে রাখীর হাতের তাস কাড়িয়া লইয়াছে; তাস কাড়িতে গিয়া কাণের দুল ধরিয়া নাড়িয়া দিয়াছে, ওড়না উড়াইয়া দিয়াছে; খেলিতে পারে না বলিয়া মিছামিছি তাস ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিয়াছে—আরও কত কি! রাখীও মাঝে মাঝে খেলা ভুলিয়া, তাসের উপর দিয়া শুধু তাহার স্বামীর দিকেই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। এ সকলই বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর কোথা হইতে এক একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার তরুণ বক্ষ ব্যথিত করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল।

ইরাণী প্রভাতে উঠিয়া গত রজনীর চিন্তার রাশিকে বিদায় করিতে চেষ্টা করিল। আবার সে প্রভাত সূর্য্য-কিরণেরই মত আনন্দের লহরী তুলিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে যেন আর একটুও অন্ধকার কোথায়ও নাই, এমনি ভাবে সে তাহার ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিল।

গত সন্ধ্যায় সে রাখীর বাড়ীতে খাইয়া আসিয়াছে। আজ তাহার ইচ্ছা হইল যে, রাখী ও তাহার স্বামীকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়। পিসিমাও তাহাতে সায় দিলেন। তবে তাহার ইচ্ছাক্রমে নিমন্ত্রিতের ফর্দ্দ কিছু বাড়াইতে হইল। কিষণ-প্রসাদের মৃত্যুর পর আমোদ উৎসব একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, বলিলেও হয়। পিসিমা দেখিলেন ইরাণী যখন ইচ্ছা করিয়াছে, তখন আরও কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা মন্দ হইবে না।

পিসিমা যাহাদের নাম করিলেন, তাহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ইরাণীর পরিচিত। ইরাণী লালাজীকেও বলিবে স্থির করিল।

সকলকেই যথারীতি পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইল। কিন্তু মোহনলালকে পত্র দেওয়া ইরাণী সঙ্গত বোধ করিল না। কারণ মোহনলাল একরূপ রাজপরিবারের মধ্যেই গণ্য।

নিমন্ত্রণের পূর্ব্বদিন মোহনলাল যখন দপ্তরে বসিয়া কাজ করিতেছিল, তখন ইরাণী সান্ধ্য-ভ্রমণ হইতে একেবারে সেখানে গিয়া হাজির হইল। প্রবীণ কর্ম্মচারীরা রাজকুমারীকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মোহনলাল বসিয়াই অভ্যর্থনা করিল।

বহুদিন মোহনলাল ইরাণীকে এত নিকটে দেখে নাই। সে যে এত বড় হইয়াছে, ইহাও তাহার নিকট নূতন বোধ হইল। সে গৃহে প্রবেশ করিলে মনে হইল যেন হঠাৎ রুদ্ধ-গৃহের জানালা খুলিয়া দেওয়াতে একরাশি চন্দ্রকিরণ জড়াজড়ি করিতে করিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার সে আনন্দ-চপল, স্বাস্থ্য ঢল ঢল শ্রীতে মোহনলাল চকিত হইল। কিন্তু সে বাহিরে কঠোরতা অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার কি কিছু কথা আছে? থাকে ত বল।"

ইরাণী বলিল, "না কাজের কথা কিছু নেই। এই কাল রাখী ও তার স্বামীকে সন্ধ্যায় খেতে বলেছি, আপনিও খাবেন"

মোহলাল সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—

"না, আমি ত খেতে পারব না।"

"কিন্তু খেতেই যে হবে লালাজী।"

"না, আমাকে মাফ কর, ইরা। আমি কিছুতেই পারব না।"

"কেন, আমি জানতে চাই। আপনার কাল স্থবিধে না হয়, আমি কালকার দিন পরিবর্ত্তন করে অন্যদিন করছি—যেদিন আপনার স্থবিধে হবে—"

"না—না—তা কেন? আমি কোনও দিন খেতে পারব না—"

"তার কারণ আমি জানতে পারি কি?" ইরাণীর চক্ষু অকস্মাৎ কেন ছল ছল করিয়া আসিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

"কারণ? আচ্ছা, কারণ অন্যদিন বল্‌বো।"

"না, আজই বল্‌লে কি ক্ষতি?"

মোহনলাল এবার একটু ব্যঙ্গের ভাবে বলিল—

"তোমার ঐ লেস্‌ ঝুলানো, বিলাতী আসবাবে সাজানো ড্রইং রুমে আমার এ খদ্দরের পায়জামা, খদ্দরের কুর্ত্তা, খদ্দরের টুপী মানাবে কি?"—

লেসের পরদার কথা শুনিয়া ইরাণীর মনে তর্কের ভাব জাগিয়া উঠিল। সে বলিল—

"লেস্‌ পরদায় এমন কি দোষ আছে? আমরা ত দেশী জিনিষ পেতে বিলাতী ব্যবহার করি নে।"—

"কিন্তু লেস্‌ পরদা না হলে যে সভ্যসমাজে একেবারে অচল হয়ে যায়, তাও ত জানিনে।"

"না অচল হবে কেন? তবে স্বরাজ আর আপনাদের মধ্যে শুধু ঐ একটু পাতলা লেসের পরদা ব্যবধান—এমন যদি হয়—"

মোহনলাল সম্মুখস্থ পুস্তক সজোরে বন্ধ করিয়া উঠিল। বলিল, "না—ও তর্কে কাজ নেই। আমি খেতে পারব না।"

মোহনলালের দৃপ্ত-মুখে নীল কাঁচের মধ্য হইতে যে আলো পড়িয়াছিল, তাহাতে তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইল। ইরাণী চমকিয়া উঠিল। সে একটু হাসিয়া বলিল,

"সে হবে না। আমি ড্রয়িংরুমে একটুও বিলাতী আসবাব রাখবো না। আপনাকে আসতেই হবে।

"পরদাগুলি কি হবে শুনি? কুশন চেয়ারগুলি কোথায় যাবে শুনি?"

"যমুনার জলে—" বলিয়া ইরাণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। মোহন লাল আবার কাজে মন দিল। ইরাণী বাহিরে কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া আবার ঘরে গেল; মোহনলালের টেবিলে কনুইয়ে ভর দিয়া দুই হাতে মস্তক রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মোহনলাল হিসাবের খাতা হইতে চক্ষু তুলিল না; ইরাণী একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। এমন শান্ত, অথচ এমন তেজস্বী; এত বলিষ্ঠ, অথচ এত ক্ষমাশীল। এত গুণী, অথচ এত নিরভিমান। এত সুন্দর, অথচ এত উদাসীন। কি আশ্চর্য্য!

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া মোহনলাল হাসিয়া ফেলিল। বলিল

"আবার কি মতলব?"

"কাল আস্‌বেন ত?"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

সে স্বরে একটুও আগ্রহ প্রকাশ পাইল না। ইরাণী বলিল, "সত্যি, আমি বিলাতী জিনিস আজ থেকে বর্জ্জন করলাম। আপনি বিশ্বাস করছেন ত?"

"কেন, আমার জন্যে?—"

"না—হাঁ আপনার জন্য। আপনি আমার অভিভাবক; আপনি বাবার মৃত্যুর পরে আমার জন্যে যা করেছেন, তাতে শুধু আপনারই জন্যে যদি বিলাতী বর্জ্জন করি, তা হলে কি অন্যায় হয়?—"

"না, তা না হতে পারে। তবে আমি আরও খুসী হ'ব সেইদিন, যেদিন তুমি আপন ইচ্ছায়—কারও দিকে না তাকিয়ে—শুধু দেশের জন্যে বিলাতী পরিত্যাগ করতে পারবে—"

"আচ্ছা;—তা'হলে আমি এখন যাই—"

মোহনলাল অম্লান বদনে বলিতে পারিল না "যাও।" আজ এ মেয়েটী—একি এক নূতন আলো লইয়া আসিয়াছে! এ চলিয়া গেলে ভাল লাগে না কেন? ইরাণী যখন চলিয়া যাইতেছে, তখন মনে হইল, ইহাকে ডাকিয়া আর কোনও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয় না? মোহনলাল খোলা বইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অক্ষগুলি একটা আর একটার স্কন্ধে চাপিয়া শুধু তিনটি অক্ষরে দাঁড়াইল—ই-রা-ণী।

ইরাণী দরজা পার হইবার সময় একবার ফিরিল। উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"লালাজী, দেখুন হারমোনিয়াম রাখতে দোষ আছে কি? রাখী গান গাইতে ভালবাসে।—"

মোহনলাল হাসিয়া বলিল, "না।"

আম্‌লারাও মনে মনে হাসিল। ইরাণীও হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

৬

পরদিন সন্ধ্যার পরে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা যদিও বেশী ছিল না, তথাপি রাজকুমারীর ইচ্ছায় রীতিমত উৎসবেরই আয়োজন হইয়াছিল। বাহিরের ফটকে রোশনচৌকী বসিয়াছিল, ফটক হইতে গাড়ী বারাণ্ডা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তোরণের মত প্রস্তুত করিয়া পত্রপুষ্পে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাহার মধ্যে চীনা লণ্ঠনের ভিতর লাল নীল রঙের বৈদ্যুতিক বাতি ঝুলানো। শুভ্র মার্ব্বেলের বারান্দায় নানা জাতীয় 'পাম' ও 'এরিকা'র টব; সেগুলির সবুজ পাতার উপর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

রাখী ও তাহার স্বামী আসিল। মহাকলরবে ইরাণী তাহাদিগকে আনিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইল। মোহনলাল তাহার ভগ্নীকে লইয়া আসিল। মোহনলালের ভগ্নীও প্রায় ইরাণীর সমবয়সী। ইরাণী তাহাকেও পত্র দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। মোহনলাল ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, লেসের পরদা নাই; তাহার স্থলে মূল্যবান কাশ্মীরের রেশমের কাজ করা কাশীর গরদ ঝুলানো হইয়াছে। ড্রয়িংরুম হইতে সমস্ত চেয়ার বিদায় করা হইয়াছে। পুরাতন পুরু পারস্য দেশীয়

কার্পেটে গৃহতল মণ্ডিত। তাহার উপর কতকগুলি খদ্দরাবৃত তাকিয়া; পূর্ব্বে প্রাচীর গাত্রে যে সকল বিলাতী ছবি ছিল, তাহাও দূরীভূত হইয়াছে, তাহার স্থলে কতকগুলি পুষ্পপত্রে গ্রথিত মালা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মোহনলাল ইরাণীর রুচির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে একখানি সুসজ্জিত প্রকাণ্ড ঘরের সমস্ত ওলট পালট করিয়া তাহাকে এইরূপ অভিনব সৌন্দর্য্য প্রদান করিতে যে পারে, তাহার রুচি ও কল্পনাশক্তির তারিফ না করিয়া পারা যায় না।

নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে সকলেই অল্পবয়স্ক, সকলেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী মুরুব্বি ধরণের লোককে ইচ্ছা করিয়াই বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইরাণীর শিক্ষা-দীক্ষা মামুলী ধরণে হইলে এরূপ সম্মিলন সম্ভব হইত না। রাজা কিষণপ্রসাদের সময় হইতেই বিলাতী চালচলন অল্পস্বল্প চলিতে থাকে। মোহনলালের অভিভাবকতায় ও ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর প্রভাবে রাজকুমারীর চালচলন অনেকটা বাধাশূন্য হইতে পারিয়াছিল। পিসিমার অনুরোধে ইরাণী সেদিন একখানি পিঙ্ক্ রঙের পারসী শাড়ী পরিয়াছিল। পিসিমা অনেক যত্নে তাহার কেশ-বিন্যাস করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েকগাছি কুঞ্চিত কেশ অলস ভাবে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বাতাসে ঈষৎ দুলিতেছিল। পিসিমা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া পুলকে, গর্ব্বে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন; আর এক এক বার কুমার জওলাপ্রসাদের দিকে সতৃষ্ণভাবে চাহিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা কমৌলির

রাজার একমাত্র পুত্র জওলাপ্রসাদ ইরাণীর রূপে মুগ্ধ হয়। বহুদিন হইতে উভয় পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য থাকাতে পিসিমার মনে একগাছি ভাবী-পরিণয়-সূত্র-গ্রথিত মাল্য রচিত হইতেছিল। জওলাপ্রসাদও যে ইরাণীর রূপে বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হইতেছিলেন, তাহা তাঁহার চোখে মুখে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। ইরাণীর চক্ষু দুইটি দেয়ালের বড় বড় আয়নার মধ্যে এক এক বার সকলের চক্ষু যাচাই করিয়া লইতেছিল।

ওস্তাদজি শরদ বাজাইয়া পুনঃ পুনঃ সেলাম করিয়া রাখিয়া দিলেন। সকলেই বাহবা দিল। মোহনলাল একমনে শুনিতে-ছিল, সে বাহবা দিতেও ভুলিয়া গেল।

ওস্তাদজির অনুরোধে ইরাণী শরদ লইল, কিন্তু হাত খুলিল না। সুরের মীড় উঠিল না; ইরাণী যন্ত্র রাখিয়া উঠিয়া গেল। সে এতক্ষণ হাল্‌কা একটি হাওয়ার মত সমস্ত ঘরে বেড়াইতেছিল; শত দীপের আলোকচ্ছটা তাহার স্ফুট-চম্পকবর্ণে পড়িয়া বিচ্ছুরিত হইতেছিল। কিন্তু ক্রমেই তাহার মনে যেন একখণ্ড মেঘ উঠিয়া সেই পুলকাকুল উৎসবের রজনীকে মলিন করিয়া দিতেছিল। সকলের অনুরোধে রাখী গান গায়িল—বসন্তের কোকিল যেন আনন্দের পঞ্চমস্বর ছুটাইয়া দিয়া আকাশ বাতাস ভরিয়া দিল।

রাখীর অনুরোধে ইরাণীকেও হারমোনিয়মে বসিতে হইল। তাহার যে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল না, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। শুধু শিষ্টাচারের অনুরোধেই সে গান করিতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু

মনে হইল যেন তাহার কণ্ঠস্বরে কত শ্রান্তি; তাহার মনে কতই বিষাদ! তবুও সে গায়িল:—

উধোজি করমকী বাত নেয়ারি।
মন মেরো চাহে মোহন মিলনকো—
করম না দেত উয়ারি।

শ্রীরাধিকা কবে উদ্ধবজিকে মনের বেদনা জানাইয়া বলিয়াছিলেন হে উধোজি করমের কথা স্বতন্ত্র; মিলনের জন্ম চিরপিপাসিত চিত্ত কর্ম্মের বিপাকে বাঞ্ছিতের সহিত মিলিতে পারিতেছে না—আর সুরদাসের সেই পদ গায়িতে আজ রাজকুমারী ইরাণীর মন এমন করিয়া সুরের মধ্য দিয়া কেন কাঁদিয়া উঠিল, তাহা কেহই বুঝিল না। ইরাণী যখন গান সমাপন করিল, তখন কি যেন কিসের মোহে সকলেই নিস্তব্ধ হইয়াছিল। কেহ একবার বলিল না যে 'সুন্দর'। মোহনলালের ভগ্নী রেবা উঠিয়া গিয়া শুধু ইরাণীর স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিল।

৭

সেদিন হইতে ইরাণীর জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিল। এতদিন যে নিশ্চিন্তভাবে আনন্দের নির্ঝরিণীর মত জীবনপথে ছুটিয়া চলিয়াছিল, সে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল। পিসিমা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন, তাঁহার ত কোনও হাত নাই। তাঁহার মনোনীত কুমার জওলাপ্রসাদ দুই একবার ইরাণীর সহিত মিত্রতা করিতে আসিলেন। কিন্তু ইরাণী

শিষ্টাচারের বিনিময় মাত্র করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। পিসিমা কুমারকে বলিলেন, "বাবা, কিছুদিন হইতে ইরাণীর শরীর ভাল যাইতেছে না।"

কুমার আশা ছাড়িলেন না। তিনিও মনে করিলেন যে ইরাণীর অসুস্থতাই তাহার মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতার বাধা জন্মাইতেছে। কিছুদিন পরে তিনি রীতিমত ঘটক পাঠাইলেন। ঘটক মোহনলালের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

মোহনলাল দেখিল যে ইরাণীর যোগ্য পাত্র জুটিয়াছে; সুতরাং সে পিসিমার সহিত পরামর্শ করিতে গেল। কিন্তু পিসিমা কোনও প্রকার আগ্রহ দেখাইলেন না। মোহনলাল ভাবিত হইল। অবশেষে সে-ও ইরাণীর অসুখের দোহাই দিয়া কিছু সময় লইল।

বাস্তবিকই ইরাণীর শরীর ভাল যাইতেছিল না। রমণীর সুখ দুঃখ রমণী যেমন বুঝে, এমন আর কেহ নহে। কাজেই ইরাণী নিজে তাহার শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই পিসিমা বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার শরীর ঠিক পূর্ব্বের মত নাই।

সেই উৎসবের পর হইতে ইরাণী মাঝে মাঝে মোহনলালের অফিস ঘরে গিয়া হাজির হইত। মোহনলালের কাজের কিছু ক্ষতি হইলেও, সে যে তাহা পছন্দ করিত, এ কথাটি স্বভাবচতুরা নারীবুদ্ধির অগোচর রহিল না। মোহনলাল এই সুযোগে তাহাকে বিষয়কর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইরাণীর বয়স

সতের বৎসর পার হইয়াছে, আর কিছুদিন পরেই তাহাকে নিজের বিষয়ের ভার নিজস্কন্ধে লইতে হইবে। এখন হইতে তাহার কর্ত্তব্য—সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লওয়া। প্রবীণ কর্ম্ম-চারীরাও একথায় সায় দিলেন।

একদিন মোহনলাল বিশেষ উৎসাহের সহিত ইরাণীকে বিষয়কর্ম্ম বুঝাইয়া তাহাকে সে সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে বলিল। ইরাণী আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিবার পরে শুধু উত্তর করিল,

"আমি কি জানি?"

মোহনলাল বলিল—

"তোমাকেই ত জান্‌তে হবে আর দিনকতক বাদে"—

"কেন, আমাকেই যে জান্‌তে হবে, তার মানে কি?"

"আমি আর ক'মাস আছি বইত নয়! শেষে ত তোমাকেই এ সকল বুঝে সুঝে করতে হবে"—

"আপনি কোথায় যাবেন, লালাজী?"

"আমি যেখানেই য়াই—তোমার এই বিষয়ের ভার ত আমাকে নামাতেই হবে"—

"ওঃ—সে আপনি পারবেন না"—

মোহনলাল হাসিল। কিন্তু সে হাসিটুকু বড়ই ম্লান। সে তাহার মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—

"না, ইরা; সে হবে না। তোমাকেই সব বুঝে নিতে হবে"—

ইরাণী বাধা দিয়া বলিল—

"না—না, সে আমি পারব না। লালাজী আপনি চলিয়া গেলে এ বিষয়সম্পত্তি সব উচ্ছন্ন যাবে। আমি কি পারি, এত বড় বিষয় সামলাতে?"—

"তা কেন? তোমার যিনি ম্যানেজার থাকবেন, তিনিই সব করবেন, তোমাকে শুধু সমস্ত বুঝে সুঝে মতামত দিতে হবে, কারণ এর যা ভালমন্দ তার জন্যে তুমিই ত দায়ী হবে"—

ইরাণী ভাবিতে লাগিল। লালাজীকে ম্যানেজার হইতে বলিলে হয় না? কিন্তু সে ভাবিয়া দেখিল যে লালাজীকে তাহার বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইতে বলিলে, তাঁহার অসম্মান করা হয়। সে ধীরে ধীরে মোহনলালের গৃহ হইতে চলিয়া আসিল। কিছুদিন আর তাঁহার নিকটে গেল না।

মোহনলাল তাহার কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে দরজার দিকে চাহিত। তাহার একান্ত চেষ্টা ছিল—কাজের মধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে। কিন্তু মন যে কখন লুকোচুরি খেলিয়া বেড়ায়, সে তাহা ধরিতে পারিত না। মনের অবাধ্যতা শাসন করিতে গিয়া সে সময়ে সময়ে দেখিত, যে সেই অবাধ্যতাটুকুই বড় মিষ্ট।

একদিন বড়ই অন্যমনস্কভাবে সে বাড়ীতে গেল। কয়েকদিন ইরাণী রোজই আফিসে আসিয়াছে; কোনও দিন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তাহার সহিত কথা কহিয়া গিয়াছে, কোনও দিন মোটরের শব্দে তাহার কক্ষ নিনাদিত করিয়া তাহাকে কাগজপত্রের কবল হইতে

সবলে জানালায় টানিয়া লইয়া আলাপ করিয়াছে। কোনও দিন সান্ধ্যভ্রমণের পর ফিরিবার মুখে আফিস ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। সে যখনই ঘরে প্রবেশ করিত, তখনই যেন আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইত। কর্ম্মচারীদিগকেও ইরাণী নানাসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া, তাহাদের কর্ম্মজীবনের ভার হাল্‌কা করিয়া দিত। কিন্তু যেদিন সে আসিত না, সেদিন মোহনলাল কিছু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। আজ ইরাণী আসে নাই, কাজেই মোহনলালের মনে প্রফুল্লতা নাই।

মোহনলালের ভগ্নী তাহা লক্ষ্য করিল। সে আজ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—

"দাদা, ইরা তোমায় ভালবাসে।"

মোহনলাল চমকিত হইয়া বলিল—

"দূর পাগলী, ইরা আমায় ভালবাসতে যাবে কেন? জওলা-প্রসাদের সঙ্গে যে তার বে'র সম্বন্ধ হচ্চে—"

রেবা চুপ করিয়া রহিল। মোহনলাল ভাবিতে লাগিল; মুখে কি চিন্তার ছাপ পড়ে? রেবা এমন করিয়া মনের কথা জানিল কিরূপে? সত্যই ত মোহনলাল ইরার কথাই ভাবিতেছিল।

৮

সত্যই কমৌলির রাজকুমার জওলাপ্রসাদ ইরাণীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম 'ইরাণীর

শরীর ভাল নহে', 'বিবাহ-প্রস্তাবের এই সময় নহে'—ইত্যাদি নানা প্রকার অজুহাতে তিনি নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু শেষে কোনও প্রকার আশাজনক উত্তর না পাইয়া, তিনি মোহনলালের গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মোহনলালের মাতার সহিত কয়োলির রাজপরিবারের সম্পর্ক ছিল। জওলাপ্রসাদ এই সম্পর্ক ধরিয়া মোহনলালের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতে লাগিলেন! মোহনলাল কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। কারণ ইরাণীর পক্ষে এরূপ সম্বন্ধ যে খুবই বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না! অথচ সে পক্ষে তেমন আগ্রহও সে দেখিতে পায় নাই; কুমারকে যে কি জবাব দিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মোহনলাল একদিন এ বিষয়ে ইরাণীর নিজের মত জিজ্ঞাসা করিবে সঙ্কল্প করিল। কাজটি যে সহজ নয়, তাহা মোহনলাল জানিত; সেইজন্যই অন্য কাহাকেও এ ভার দিতে সাহস করিল না। পিসিমার সহিত পরামর্শ করিয়া সে স্থির করিল যে, ইরাণীকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করা ভাল। পিসিমাও বলিলেন যে, মোহনলাল স্বয়ং এ বিষয় ইরাণীর সহিত কথা কহিলে ভাল হয়।

এই স্থির করিয়া মোহনলাল একদিন সকাল সকাল জাতীয় বিদ্যালয় হইতে বরাবর রাজবাড়ীতে আসিল। ইরাণী তখন মেমসাহেবের সহিত টেনিস্ খেলিতেছিল। মোহনলালকে সেই সময়ে আসিতে দেখিয়া ইরাণী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—

"লালাজী, খেলবেন্?"

মোহনলাল বলিল,

"আমি খেলা ভুলে গেছি।"

ইরাণী অভিমানের স্বরে মেমকে শুনাইয়া বলিল—

"খেলা ভুলে যাননি—বোধ হয় বিলাতী খেলা বলে' আপত্তি"—

মেম হাসিয়া মোহনলালকে জিজ্ঞাসা করিল :—

"তাই নাকি লালাসাহেব? বিলাতী খেলার সঙ্গেও নন্-কো-অপারেশান?"—

মোহনলাল অপ্রতিভ হইল। অস্তগামী সূর্য্যের লালিম কিরণজাল ইরাণীর শ্রম-রক্তিম মুখে পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু আজ মোহনলাল তাহার মনকে এমন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দিবে না স্থির করিল। সে আজ কাজের কথা কহিতে আসিয়াছে। আজ এমন বিমনস্ক হইলে কি চলে?

সে তাহার চাদরটি ভূমিতে রাখিয়া একখানি 'র‍্যাকেট' লইল দেখিয়া, মেমসাহেব 'লন' হইতে বাহিরে আসিলেন। ইরাণীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। মোহনলাল অনেক দিন না খেলিলেও, সে যে এক সময়ে বেশ ভাল খেলিত, তাহা ইরাণী অল্পক্ষণেই বুঝিয়া লইল।

খেলা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই দুইটি অশ্ব সজ্জিত হইয়া আসিল। ইরাণী বেড়াইতে যাইবার জন্য লালাজীকে ধরিল। মোহনলাল মেমসাহেবের দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—

"হাঁ লালাসাহেব, আপনি আজ ইরার সঙ্গে বেড়াতে গেলে আমি সুখী হ'ব। আমার সহরে একটু কাজ আছে, সেটা আমি তা'হলে সারতে পারি।"

মেমসাহেব আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া গেলেন। সহিস একটি ঘোড়ার সাজ বদলাইয়া আনিল। খেলা শেষ হইলে মোহনলাল ও ইরাণী দুই অশ্বে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইল।

খসরুবাগের পাশ দিয়া যে রাস্তা বরাবর কেল্লার দিকে গিয়াছে, সেই রাস্তায় দুইজনে পাশাপাশি হইয়া চলিল। কিছুদূর মৌনভাবে গিয়া, ইরাণী জিজ্ঞাসা করিল—

"রেবা, আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসে না কেন, লালাজী?"

মোহনলাল উত্তর করিল—

"কেন আসে না, তা জানিনে। বোধ হয় বড় হয়েছে বলে' মা বেশী বেরুতে দেন না তাকে।"

"এমন কি বড় হয়েছে, রেবা! আমারই ত বয়েস প্রায়, না?"

মোহনলাল একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—

"হবে, বোধ হয়। সে আমার আট ন'বছরের ছোট।"

"রেবা বড় ভাল মেয়ে। যেমন দেখ্‌তে, তেমনই স্বভাব। আপনার যোগ্য বোন্, লালাজী।"

ইরাণীর এই পরোক্ষভাবে সুখ্যাতি মোহনলালকে কিছু বিব্রত করিয়া তুলিল। তাহার মুখ যে লাল হইয়া উঠিল, তাহা ইরাণী লক্ষ্য করিয়া হাসিল।

মোহনলাল বলিল—"রেবার বিয়ে বিয়ে করে মা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন"—

ইরাণী অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিল—"তা বে'র বয়স ত হয়েছে, মা ভাববেনই ত—"

হাঁ, তোমাদের দু'জনের বিয়ে হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

"ওঃ আমার জন্যেও বুঝি আপনার ভাবনা পড়েছে?—"

ইহার ভিতরে যে একটু শ্লেষ ছিল, তাহা মোহনলালের বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

"কেন, তোমার জন্যে ভাব্‌তে কিছু দোষ আছে? তোমারও ত বিয়ের বয়েস হয়েছে—"

ইরাণী চুপ করিয়া রহিল। মোহনলাল বলিল—

"ভেবে দেখ ইরা, রেবা ও তুমি আমার কাছে দুই-ই সমান। আমাকে দু'জনের জন্যেই ভাবতে হবে।"

ইরাণী কিছুই বলিল না। মোহনলাল সাহস পাইয়া বলিল—

"তোমার জন্য উপযুক্ত পাত্রই পেয়েছি। রেবার জন্যে ঐ রকম একটি ভাল বর পেলে বাঁচি।"

ইরাণী এবারে হাসিয়া ফেলিল।

"আমার জন্যে কোথায় পাত্র জোটালেন, শুনি?—"

মোহনলালের মনে হইল, এতখানি বেহায়াপনা করা ইরার উচিত নহে। সে গম্ভীরভাবে বলিল—

"কমৌলির কুমারের সঙ্গে কথা চল্‌ছে"—

"ওঃ আপনি রীতিমত ঘটকালী জুড়ে দিয়েছেন দেখ্‌ছি।" মোহনলাল চুপ করিয়া রহিল। সে এরূপ পরিহাসের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইরাণী বলিল—

"কুমার বাহাদুর বোধ হয় হীরের আংটি দিয়ে ঘটক বিদায় করবেন।—"

"হীরের আংটি, কেন ?—"

"সেদিন দেখলাম যে তাঁর দশ আঙুলে বোধ হয় কুড়িটা হীরের আংটি হবে, অত আংটি যার হাতে, তার দু'চারটে দিতে বোধ হয় আটকাবে না—"

মোহনলাল বলিল—"হাঁ, কুমারের আংটির সখ খুব—তুমি বল্‌তে মনে পড়ল, সেদিন তোমাদের বাড়ীতে দেখেছিলাম বটে। কিন্তু লোকটি খুব ভাল, স্বভাব চরিত্র অতি সুন্দর, বয়েসও বেশী নয় ; বোধ হয় চব্বিশ পঁচিশ হবে—"

মোহনলাল আরও বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু ইরাণী হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলিল—

"লালাজী আপনি বৃথা কষ্ট করবেন না। আমার এ বিবাহে মত নেই।"

এই বলিয়া সে ঘোড়া ফিরাইয়া দিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। দু'জনে ঘোড়া ছুটাইয়া গৃহে ফিরিল, কিন্তু আর একটিও কথা হইল না।

৯

কুমার জওলাপ্রসাদকে জবাব দিবার জন্য মোহনলালকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কারণ ইরাণী সেই সান্ধ্যভ্রমণের দুই একদিন পরেই এত অসুস্থ হইয়া পড়িল, যে আপাততঃ বিবাহের প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। কুমারের আগ্রহ যে তাহাতে কিছুমাত্র ন্যূনতাপ্রাপ্ত হইল, এরূপ বুঝা গেল না। কারণ তিনি মোহনলালের বাড়ীতে নিত্যই আসিতে লাগিলেন।

ইরাণী ডাক্তারের পরামর্শে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য শিমলায় রওনা হইল। সঙ্গে পিসিমা ও মেমসাহেব গেলেন। ম্যালের নিম্নে একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। মোহনলাল গেলে বৈষয়িক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, কাজেই পুরাতন একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে লইয়া ইরাণী শিমলায় আসিল।

শিমলায় আসিয়া কিছুদিনের মধ্যে তাহার অসুখ ভাল হইল বটে, কিন্তু তাহার মনের প্রফুল্লতা কিছুতেই ফিরিয়া আসিল না। পিসিমা ও মেমসাহেবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইরাণী অনেক সময়ে গম্ভীর হইয়া থাকে—যেন কতই ভাবনা তাহার মনে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কোনও প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় এবং নিজের বোকামির জন্য নিজেই শেষে হাসিয়া ফেলে। সে হাসিও ম্লান। কৌচের উপর হয় ত একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিল, বই কোলের উপর খোলা পড়িয়া রহিল, সে হয় ত জানালা দিয়া সুদূর আকাশের দিকে

তাকাইয়া থাকিত! সে দেখিত শরতের উজ্জ্বল নীল আকাশ,—পাহাড়ের পর পাহাড়ের স্তর ঢেউ খেলিয়া সুদূর দিকচক্রবালে গিয়া মিশিয়াছে; পাইন গাছের সারি ধাপে ধাপে উঠিয়া, নামিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতমালাকে হরিৎবর্ণের আস্তরণে ঢাকিয়া দিয়াছে। ইরাণী অশ্রান্ত-নয়নে এই স্বর্গের লীলাবৈচিত্র্য দেখিয়া সময় কাটাইত।

শরতের সোণালি অপরাহ্ন যখন সন্ধ্যার নীলিমায় মিশিত, তখন পিসিমার নিতান্ত পীড়াপীড়িতে কোনও কোনও দিন ইরাণী বেড়াইতে বাহির হইত। সে ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসে, তাহার জন্য নিত্যই অশ্ব সজ্জিত থাকিত। সে মোটর চালাইতে ভালবাসে, এইজন্য এলাহাবাদ হইতে দুখানি মোটর আনাইয়া লওয়া হইল। কার্টরোডে নামিয়া কোনও কোনও দিন সে মোটরেও বেড়াইতে যাইত। কিন্তু কিছুদূর গিয়া কোনও না কোনও ছল করিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিত। কিছুই যেন তাহার ভাল লাগে না। পিসিমা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে শরৎ হেমন্তে পরিণত হইল। রৌদ্রের প্রখরতা কমিয়া আসিল। যেদিন মেঘ করিত বা এক পশলা বৃষ্টি হইত, সেদিন শীতের হাওয়া বহিত। ইরাণীর জন্মদিন নিকট হইয়া আসিল। পিসিমা মোহনলালকে লিখিলেন, এবারে ঘটা করিয়া ইরাণীকে জন্মদিনের উপহার দিতে হইবে। মোহনলাল কখনও এই জন্মদিনের খবর রাখিত না। কিন্তু এবারে পিসিমা

যখন লিখিয়াছেন, তখন তাহাকেও কিছু দিতে হয়, না দিলে ভাল দেখায় না।

মোহনলাল জানিতে চাহিল, ইরাণী কি পাইলে খুসী হয়। ইরাণী কিছুই স্থির করিতে পারিল না; সে শুধু জানাইল যে লালাজী যাহা নিজহস্তে দিবেন, তাহাই সে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিবে। ডাকের মারফতে সে কিছুই লইতে চাহে না। পিসিমাও এই চিঠির সঙ্গে তাহাকে জন্মদিনের উৎসবে আসিবার জন্য রীতিমত নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন।

মোহনলালের পক্ষে এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইল না। সে ইরাণীকে লিখিল, "এই জন্মদিনে তুমি উনিশ বছরে পড়িবে। তোমার পিতার সম্পত্তি যাহা এতদিন আমার নিকট গচ্ছিত ছিল, এবং যাহা আমি আমার সাধ্যমত বাড়াইয়াছি, তাহাই তোমাকে আমি এই জন্মদিনে উপহার দিব। রাজা-বাহাদুরের যে নগদ টাকা ছিল, তাহার খবর তুমি বোধ হয় কখনও জানিবার চেষ্টা কর নাই; আমি এই কয়েক বৎসরে সে টাকা প্রায় দ্বিগুণ বাড়াইয়াছি, তাহাই তোমাকে তোমার জন্ম-দিনে উপহার দিয়া বিদায় লইব। আমার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন তুমি উপযুক্ত হইয়াছ, তোমার বিষয়সম্পত্তির ভার তুমিই গ্রহণ কর। আমি শিমলায় গিয়া তোমার জন্মদিনে সমস্ত তোমাকে বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিব। রেবাকে আমি যেরূপ স্নেহের চোখে দেখি, তোমাকেও সেইরূপ। আমার প্রতি তোমাদের উভয়েরই দাবী সমানভাবে থাকিবে।"

ইরাণী অনেকবার এই চিঠি পড়িল; পিসিমাকে পড়িয়া শুনাইল। মোহনলাল বিদায় লইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া পিসিমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। চিঠি পড়িবার সময় ইরাণীর কণ্ঠও বাষ্পে ভরিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার জন্মদিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার অবসাদ দূরে গেল। সে আবার আগের মতই হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে ঘরে মোহনলালকে থাকিতে দিবে, তাহা সে নিজে থাকিয়া সাজাইল। জন্মদিনে কিরূপ খাওয়া দাওয়া ও উৎসবের বন্দোবস্ত হইবে, তাহা সে নিজে স্থির করিয়া দিল। অসুখের যে ম্লান ছবি তাহার সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই অপসারিত হইল।

মোহনলাল আসিল। ইরাণীর শরীর শেষের কয়েকদিনের মধ্যে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিল। কার্ত্তিকমাস শিমলায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর সময়; স্বাস্থ্যও এই সময়ে ভাল হয়। কাজেই আর কিছুদিন থাকিলে যে ইরাণী একেবারে নিরাময় হইয়া যাইবে, এ সম্বন্ধে মোহনলাল বিশেষ ভরসা করিয়া বলিল।

জন্মদিন আসিল। স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করিয়া চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া, ইরাণী দেবতার অর্চ্চনা করিল। পরে সকলকে যথাযোগ্য উপঢৌকন দিয়া প্রণাম ও সম্ভাষণ করিল। তাঁহারাও উপহার যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা জানাইলেন। মোহনলালকে প্রণাম করিতে গিয়া ইরাণী চোখের জল ফেলিল;

মোহনলালও চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কম্পিতহস্তে একটি সুবর্ণ-খচিত চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সে ইরাণীর হাতে দিল এবং তাহার চাবিটি দিয়া বলিল, "এর মধ্যে তোমার সিন্ধুকের চাবি ও একটি হিসাবের বই আছে, দেখে নাও। আজ আমার ছুটী!—"

মোহনলাল উঠিয়া দ্রুতপদে বাহিরে গেল। ইরাণী স্তব্ধ হইয়া সেই বাক্স হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন আহারাদি শেষ হইতে হইতে অপরাহ্ন হইয়া গেল। তারপর পাহাড়ী নাচ ও ম্যাজিক হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আকাশের নীলিমায় একটু একটু করিয়া রঙ ফলাইতেছিলেন। বিকালে এক পশলা বর্ষা হইয়া যাওয়াতে আকাশ একেবারে মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। বাতাসে যদিও শীতের একটু আমেজ দিয়াছিল, তথাপি সান্ধ্য-ভ্রমণের পক্ষে সে সন্ধ্যা অতি প্রলোভনজনকরূপে দেখা দিল। ম্যালের রাস্তা দিয়া দলে দলে সাহেব মেম, পাঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষ বাহির হইয়া পড়িল। ইরাণীও বাহির হইবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিল; মোহনলালকেও অনুরোধ করিল।

উভয়ে মোটা কাপড় গায়ে দিয়া কার্টরোডে নামিয়া আসিল; সেখানে মোটর লইয়া সোফেয়ার অপেক্ষা করিতেছিল। ইরাণী বলিল সে নিজেই গাড়ী হাঁকাইবে। সুতরাং সোফেয়ার তাহার সহিসকে ডাকিয়া দিল; সে গাড়ীর পশ্চাতে বসিল। ইরাণী চাকা লইয়া বসিল। মোহনলাল সামান্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া ইরাণীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

শিমলা হইতে কালকা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা পর্ব্বত ঘুরিয়া নামিয়া গিয়াছে তাহারই নাম কার্টরোড। মোটরের রাস্তা শিমলায় মাত্র এই একটি; সুতরাং তাহারা এই রাস্তা ধরিয়া নামিতে লাগিল। এই রাস্তায় মোটর চলে বটে; কিন্তু চালককে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ প্রত্যেক দশ-কুড়ি গজ অন্তর পার্ব্বতীয় রাস্তা ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রতিমুহূর্ত্তেই চাপা দিবার আশঙ্কা। কাজেই ইরাণী একমনে, বাঁশী বাজাইয়া, চাকা ঘুরাইয়া গাড়ী চালাইতেই ব্যস্ত হইল; কথা কহিবার অবকাশ পাইল না। একবার মাত্র মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিল—

"বড় গাড়ীখানা কি হলো ?"

ইরাণী উত্তর করিল—

"সেখানা ঠিক আছে, এ রাস্তায় ছোট গাড়ীই ভাল; দেখছেন না জায়গায় জায়গায় রাস্তা কত সরু ?"

তারপর একটু থামিয়া বলিল—

"আপনার কি বসতে অসুবিধা হচ্চে !"

"কিছু না" বলিয়া মোহনলাল ভাল হইয়া বসিল। ইরাণীর অঙ্গস্পর্শে তাহার যে কোনও আপত্তি ছিল, তাহা নহে; তথাপি আজ তাহার মনে হইল যেন আরও একটু ব্যবধান মাঝখানে থাকিলে ভাল হইত।

বহুক্ষণ ধরিয়া মোটর চলিল। বিকালে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; মাটী ভিজিয়া নরম হইয়া রহিয়াছে; তাহার উপর দিয়া রবারের

চাকা অনায়াসে হাল্‌কা গতিতে চলিতে লাগিল। রাস্তা ক্রমেই নামিয়া গিয়াছে, সুতরাং বড়ই আরামে আজ গাড়ী চলিতেছিল।

সহিস একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল। এত রাত্রি হইয়া গেল, তবুও মনিবদের ফিরিবার নাম নাই; এমন ত কখনও হয় না। পেট্রল বেশী করিয়া আনিলে হইত!

বাস্তবিকই পেট্রল ফুরাইয়া আসিয়াছিল এবং শোণীর নিকটে গিয়া গাড়ী একেবারেই থামিয়া গেল।

দু'ধারে পাহাড়, মাঝখানে সরু রাস্তা—চাঁদের আলোয় রজত রেখার মত দেখাইতেছে, এমনই অবস্থায় একস্থানে গাড়ী সহসা থামিয়া গেল। সহিস নামিয়া পড়িয়া বনেট্ খুলিয়া দেখিল ভ্যাকুয়মে পেট্রল নাই। সে ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; মনে করিল আজই তাহার চাকরী যাইবে। কিন্তু ইরাণীর ব্যবহারে আশঙ্কার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে মোহনলালের প্রশ্নের উত্তরে অতি সহজভাবে বলিল—

"পেট্রল ফুরিয়েছে।"

"এখন উপায়?"

ইরাণী আকাশে হাত তুলিয়া বুঝাইল যে, উপায় ভগবান। মোহনলাল চিন্তিত হইল। হঠাৎ ইরাণীর মনে পড়িল, শোণীতে সৈন্যদের একটি ছাউনি আছে, সেখানে হয় ত পেট্রল পাওয়া যাইতে পারে। সহিসকে পেট্রল আনিতে পাঠাইয়া উভয়ে পায়চারী করিতে লাগিল।

কার্টরোড হইতে অনতিপ্রশস্ত রাস্তা একটি পাহাড়ের উপরি-

ভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে ; ইরাণী সেই রাস্তা ধরিয়া চলিল। মোহনলালও চলিল। উভয়ে নীরব। রাত্রি তখন প্রায় ৯টা। যদি পেট্রল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে, এই চিন্তায় মোহনলাল উদ্বিগ্ন হইতেছিল। ইরাণী তাহাকে সাহস দিয়া বলিল, সে চিন্তায় কোনও ফল নাই। যাহা হইবার তাহা হইবেই। সে তাহার অভ্যস্ত চঞ্চলগতিতে পর্ব্বতের উপর উঠিল। মোহনলাল তাহার সহিত গতিরক্ষা করিতে গিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। পাহাড়ের উপরে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে একখানি প্রস্তর পড়িয়া ছিল। উভয়ে সেই পাথরের উপর গিয়া বসিল।

নিস্তব্ধ রজনী, জনমানবের সাড়াশব্দ কোথাও নাই। নিম্নে পাইনবৃক্ষের সারি স্তরে স্তরে নামিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাকে নিস্তব্ধতা যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। দূরে নির্ঝরিণীর কলতান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। আজ বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় সমস্ত ঝরণাগুলি যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। নিম্নের উপত্যকা হইতে তাহাদের মৃদুগম্ভীর সঙ্গীতে ঘুমের রাগিণী বাজিতেছে। জোছনা আজ নীল আকাশে মাতাল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে—দূরে পাহাড়ের গায়ে চন্দ্রকিরণের কুয়াসা জমিয়া উঠিতেছে।

ইরাণী বলিল—"কি সুন্দর রাত !"—

মোহনলাল বলিল—"কি সুন্দর স্থান।"

ইরাণী বলিল—"আজ আমার জন্মদিন।"

মোহনলাল বলিল—"আজ আমার ছুটি"—

ইরাণী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"আজ আমি স্বাধীন"—

মোহনলাল ইরাণীর দুই হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল—"আজ তুমি স্বাধীন ; ইরা, আজ আমার বিদায়নিশি"—ইরাণী হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল না ; চুপ করিয়া রহিল। তাহার সমস্ত শরীর উদ্বেলিত করিয়া কান্না আসিতেছিল। মোহনলালও চোখের জল মুছিল।

ইরাণী একখানি হাত ছাড়াইয়া লইয়া, পকেট হইতে সেই চন্দনকাঠের বাক্‌সের চাবি বাহির করিয়া মোহনলালের হস্তে দিল। বলিল—

"এ চাবি আমি নিয়ে কি করবো? তোমার চাবি তুমি লও। আমি শুধু তোমার দাসী হয়ে থাকবো"—

ইরাণী আগে কখনও মোহনলালকে 'তুমি' বলিয়া সম্ভাষণ করে নাই। মোহনলাল আবেগভরে ইরাণীকে বক্ষে টানিয়া লইল ও তাহার কম্পিত অধরপুটে ও ললাটে গাঢ় চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

নিম্নে মোটরের বাঁশী শুনিয়া তাহারা বুঝিল সহিস ফিরিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এ তাহাদের গাড়ীর বাঁশী নহে।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া পিসিমা বড় গাড়ীখানা লইয়া সোফেয়ারকে অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সোফেয়ার জানিত ছোট গাড়ীতে পেট্রল খুব কমই আছে। সুতরাং সে একটিন পেট্রলও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সেই পেট্রল ঢালিয়া

ছোট গাড়ীতে ইরাণী ও মোহনলাল বসিল। সহিস আসিলে সে ও সোফেয়ার বড় গাড়ীতে ফিরিল।

এবারে মোহনলাল ইরাণীর কাছে ঘেঁসিয়া বসিতে আপত্তি করিল না।

*　　*　　*　　*　　*

কিছুদিন পরে তাহারা যখন এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিল, তখন মোহনলাল কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চিন্তা জওলাপ্রসাদকে বলিবে কি ? সে নিশ্চয়ই মনে করিবে যে মোহনলাল প্রথম হইতে চক্রান্ত করিয়া এই বিবাহ হইতে দিল না। কিন্তু তাহাকে বেশীক্ষণ চিন্তায় ক্লেশ দিতে পারিল না। কারণ তাহার মাতা প্রথমেই তাহাকে সংবাদ দিলেন যে, রেবার সহিত কুমারবাহাদুরের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। রেবাও লজ্জানম্র বদনে তাহার সমর্থন করিল।

পথি নারী বিবর্জ্জিতা

এই মহাশাস্ত্র বাক্যটির প্রতি আজকাল তেমন আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারীজাতির প্রতি পুরুষের চিরদিনই ভক্তি আছে; কিন্তু আজকাল এই ভক্তিপ্রবণতা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, রাস্তা ঘাটেও নারী নহিলে—অন্ততঃ তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবার জন্য—আর চলে না। শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস বলিয়াই হউক, আর ঠেকিয়া কিঞ্চিৎ শিখিয়াছি বলিয়াই হউক, আমার এখন পথে নারী দেখিলেই মনে হয়, তাঁহাদের গায়ে মোটা মোটা অক্ষরে যেন লেখা আছে—বিবর্জ্জিতা; এক বচনেও বটে, বহু বচনেও বটে; যেহেতু শাস্ত্র বচন কখনও মিথ্যা হয় না।

সেদিন ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে জে, সি, চাটুর্য্যের অফিসে গিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে প্রায়ই যাই। চাটুর্য্যে আজকাল বড়লোক হইয়াছেন, ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু একদিন ক্লাশে আমার নীচে বসিতে হইত! আমি পরীক্ষায় তুকুড়ি সাতের জোগাড় রাখিয়া দিতাম বরাবরই, জে, সি, অর্থাৎ জীবন চন্দ্র প্রায় ফেল মারিত। তবুও আমাদের মধ্যে বেশ প্রণয় ছিল। আমি অফিসে ঢুকিলেই জে, সি, একবার একটু হাসিয়া তাহার

বিরল কেশ মাথা দুলাইয়া বুঝাইয়া দিত যে সময় নাই, সময় নাই। এর কোনও দিন ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু ঐ ঘাড়-নাড়ার মধ্যে বেশ বুঝা যাইত যে জে, সি, তাহার পুরাতন সহপাঠীকে ভুলিতে পারে নাই।

আমিও ত কাজের লোক বটে; আমি বন্ধুবরকে বিরক্ত না করিয়া চট্ করিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িতাম। প্রথমতঃ জে, সি, কাজের লোক, তার প্রতি মিনিটের দাম হয় ত কত মুদ্রা, কে জানে? দ্বিতীয়তঃ পাশের ঘরে তাহার টাইপিষ্ট কাজ করিত। দু'তিনটি টাইপ-রমণী নিয়ত কল চালাইয়া চালাইয়া হয়রাণ হইয়া যাইত। এত কি লিখিতে হয়, কে জানে? ব্যবসাতে লেখাপড়ার দরকার হয় না, অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু আমি দেখি যে ব্যবসাও ঝকমারি কম নয়! বন্ধুবরের এখন যেরূপ লেখাপড়ার বহর তার সিকির সিকি বাল্যকালে থাকিলে —নাঃ, তাহা হইলে হয় ত ছোট আদালতের উকীল হইয়া আমারই মত পশার হইত! যাহা হউক, ঐ টাইপ-রমণীদের মধ্যে একজনকে বেশ বনিয়াদী ঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হইত! তার নাম মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্ট্। এ মেয়েটিকে দেখিলে, সে যে অল্প মাহিনার নকরী করে, তাহা বোধ হইত না। তাহার পোষাকে, পরিচ্ছদে, চাল চলনে বেশ একটু রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহার বয়সও অন্যান্য টাইপিষ্ট অপেক্ষা কম।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যেদিন এই মেয়টি নিযুক্ত হয়, সেদিন আমি জে, সির অফিসে বসিয়াছিলাম। জে, সি, নিজেই

আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেয়। তার পরে আমার কোনও লেখা টাইপ করিবার প্রয়োজন হইলেই আমি সটান জে, সির অফিসে আসিয়া হাজির হইতাম এবং জে, সিও ঐ মেয়েটির হাতে আমার কাজ ফেলিয়া দিতেন। জে, সি, সৌজন্যে চিরদিনই অতুলনীয়।

কিছুদিন পরে আমি যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া গেলাম, তখন আমায় প্রায় প্রত্যহই জে, সির অফিসে আসিতে হইত। সেবার অসহযোগ নীতির ফলে অনেক বাজে লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, কাজেই আমাকে সব বিষয়ে একটু নজর রাখিতে হইত। কাউনসিলে বক্তৃতা যে বড় বেশী আমাকে করিতে হইত, তাহা নহে। তবুও প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম সর্ব্বদা; কারণ উপস্থিত বক্তৃতা আমার কোনও কালে অভ্যাস ছিল না। এই কাউনসিলের ব্যাপারে আমার টাইপ করিবার প্রয়োজনও কিছু বলবৎ হইয়া উঠিল। প্রতিদিন জে, সির অফিসে আসিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকিত! কিন্তু জে, সি, লোক অতি অমায়িক।

এখন আর জে, সিকে বলিয়া দিতে হয় না, আমি নিজেই দরজা ঠেলিয়া সটান ঢুকিয়া পড়ি। এবং মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্‌ট্‌কে নানা প্রকার মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিয়া আমার বক্তৃতার কাপি 'যন্ত্রস্থ' করাই। আমি আমার লেখাটি পড়িয়া দিতাম, তাহাতে কাজ দ্রুত অগ্রসর হইত। এভাবে মেমসাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও সুতরাং অগ্রসর হইত।

আমার একটি নেশা ছিল, নস্য লওয়া। মিস্ ভ্যাণ্ডারবিলট্ তাহাতে বড় কৌতুক বোধ করিত। আমি নিজের মস্তিষ্ক সাফ্ করিবার জন্য মাঝে মাঝে নস্য লইতাম,—বিশেষতঃ হাতের লেখা পড়িতে পড়িতে যখন নিদ্রাবেশ হইত। কিন্তু একটু বেশী সান্নিধ্য হেতু সেই ঝাঁঝালো নস্যের দুই চারিটা কণিকা বিদ্যুৎ-বীজনের দ্বারা বাহিত হইয়া সময় সময় তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত। তখন মেমসাহেব হাঁচিয়া, হাসিয়া অস্থির হইত। অবশ্য তাহাতে তাহার কাজের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত যে হইত না, এমন নহে। লেখাতেও অনেক গলদ পড়িয়া যাইত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার এই বক্তৃতাগুলি অনেক সময়ে 'টাইপস্থ' রহিয়া যাইত। ভবিষ্যতে যদি আমার বক্তৃতা কেহ সংকলন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে শুধু আমার লেখার উপর চূণকাম করিলে চলিবে না; মেমসাহেবের অনিচ্ছাকৃত 'ব্যাসকূট'গুলির একটা হেস্তনেস্ত করিতে হইবে!

সে যাহা হউক, বেচারী আমার জন্য মেহনৎ করিত যথেষ্ট। আমার এমনও কখনও কখনও মনে হইত যে আমার বক্তৃতাগুলি টাইপ করিয়া সে গৌরব অনুভব করিতেছে। কারণ জে, সি, যত বড়ই ব্যবসায়ী হউন না, নাম ত বেণে; তার বেশী ত কিছু না। কাউনসিলের মেম্বর, আইন ব্যবসায়ী, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট এট্‌সেটেরা, এট্‌সেটেরার বক্তৃতা টাইপ করিবার সৌভাগ্য ক'জন মেয়ের ঘটে? মিস্ ভ্যাণ্ডারবিলট্‌কে একেবারে অমনি খাটাই নাই। আমার একটি আসল মাদার-অব-পার্‌লের নস্যের কৌটা

ছিল, সেইটার প্রতি মেমসাহেবের লোভ হয়। আমি তৎক্ষণাৎ সেটা 'প্রেজেণ্ট' করিয়া দিলাম। আমার বেশী লোকসান হয়নি। ও কৌটাটি আমি এক ফিরিওয়ালার নিকট অষ্ট গণ্ডা পয়সায় কিনি। শুনিয়াছি প্যারিসে ওর দাম বিস্তর। বোধ হয় বেটা চোরাই মাল আমাকে সস্তায় দিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, যেদিনকার কথা বলিতেছিলাম, সে বোধ হয় ১লা এপ্রিল। তার পরদিন কাউন্সিল হইয়া বন্ধ হইবে। ওদিনটা ছিল ছুটি। আমি আদালত থেকে বরাবর ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে গিয়া গরুবাছুর খোঁয়াড়ে দিবার যে আইন আছে, তাহার সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাবের সমর্থন কল্পে এক বক্তৃতা লিখিয়া তাহাই টাইপ করাইতেছিলাম। এমন সময়ে মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্ট্ 'কলিক' বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িল, এবং টাইপ শেষ করিতে না পারার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল। আমি আর কি করি? বেচারীকে ছুটী দিবার জন্য জে, সিকে বলিলাম। জে, সি ঈষৎ হাসিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মেমসাহেবের প্রতি আমার যে কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, জে, সি, একদিন এরূপ একটু ব্যঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; আজ তাঁহার হাসিতেও সে ভাবটি প্রকাশ পাওয়ায় আমি প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় দেখিলাম, রুমালের ব্যাগ ও ছাতা হস্তে লইয়া মেমসাহেব জে, সির ঘরে আসিয়া অতি কাতরভাবে জানাইল যে তাহার অসুখ করিয়াছে।

জে, সি বলিলেন, "তা হলে, একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বল্‌ব কি ?"

"না, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, অনেক ধন্যবাদ। আমি যেতে যেতে একটা ট্যাক্‌সি ডেকে নেবো এখন। নমস্কার।" বলিয়াই একদৌড়ে গিয়া মেমসাহেব লিফ্‌টে উঠিল, আমিও তৎপর ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমিও লিফ্‌টে চড়িলাম।

মেমসাহেব আমার ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি মহাশয়, আপনি কোথায় যাবেন ?"

আমি বলিলাম, "তোমাকে ট্যাক্‌সিতে তুলে দিয়ে আমি কোর্টে যাব।"

"তার কিছু দরকার নেই, অত্যন্ত ধন্যবাদ।"

"সে কি মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্‌ট ? তুমি আমায় কি অকৃতজ্ঞ ঠাউরেছ ? তুমি 'কলিকে' কষ্ট পাচ্ছ ; আর আমি তোমায় একটু পৌঁছে দিতে পারব না ?"

মেম সাহেব এক কথায় নিরুত্তর। ব্যথাটা ও ক্রমশঃ বাড়িতেছিল বোধ হয়। রাস্তায় নামিয়া ট্যাক্‌সি বা গাড়ী কিছুই দেখা গেল না। মেমসাহেবের চোখে জল আসিল। "আমি বলিলাম, তুমি একটু দাঁড়াবে ? আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্য ট্যাক্‌সি ডেকে আনি ?"

মেমসাহেব বলিল, "না, মিষ্টার বটব্যাল আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না ; ধন্যবাদ। আমি আস্তে আস্তে যেতে পারব বোধ হয়।"

কিন্তু তখন তাহার চলিবার শক্তি যে বেশী ছিল, তাহা বোধ হইতেছিল না। আমি বলিলাম "তা হলে এক কাজ কর, আমার বাহুর উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এস। এর মধ্যে একটা ট্যাক্‌সি ফ্যাক্‌সি এসে যাবে। অন্যদিন বেটারা ভোঁ ভোঁ করে কান ঝালাপালা এবং প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করে তোলে, আজ এক ব্যাটারও পাত্তা নেই!"

মেমসাহেবকে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইল। জীবনে সেই মেমসাহেবের অঙ্গ স্পর্শ! রাস্তার মাঝে না হইলে যে একটা পুলক শিহরণ অনুভব করিতাম সর্ব্বাঙ্গে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার হৃদয়ে একদিকে যেমন আনন্দের একটু আমেজ আসিল, অপর দিকে তেমনি বড় লজ্জা করিতে লাগিল। আলাপী যদি কেহ দেখিয়া যায়, কি মনে করিবে? আমার বয়স পঞ্চাশের দিকে গড়াইয়াছে, তার সবে কুড়ি কি বাইশ। আমার রঙ কিছু বেশী ঘোরালো, তার রঙ বড্ডই ফরসা। আমি কিছু খর্ব্ব, সে আমা অপেক্ষা অন্ততঃ তিন ইঞ্চি লম্বা। বড়ই বে-মানান, বড়ই অসামঞ্জস্য ঠেকিতে লাগিল। কেহ যদি লক্ষ্য করিয়া দেখে! চোখ বুজিয়া চলিলাম পাছে পরিচিতের সঙ্গে চোখো চোখি হয়। মুক্ত হস্তটি একবার পকেটে চালাইয়া দিলাম, নস্যের কৌটার সন্ধানে। কিন্তু সেটি অপর পকেটে ছিল, সুতরাং নিরুপায় হইলাম।

এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ চলিয়াছি; মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্‌ট্‌ও বোধ হয় কিছু আরাম বোধ করিতেছিল; কেন না পূর্ব্বে আমার

উপর যতখানি ভর সে দিয়াছিল, ক্রমেই তাহার লাঘব হইতেছিল। প্রথমে সে কথা কহিতে পারিতেছিল না, পরে সে একটু আধটু হাস পরিহাসও জুড়িয়া দিল। বলিল, "আপনি কাল খোঁয়াড়ের গরুর কি ব্যবস্থা করবেন, মিষ্টার বটব্যাল? খাতাপত্র সব যে আমার ডেস্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে হাঁফিয়ে উঠছে।"

আমি বলিলাম, "সে যাক্‌গে যাক্। উপস্থিত-বল্‌তেও আমার কিছু আটকাবে না। আমার বক্তৃতা শুনে সেদিন চিফ্ সেক্রেটারী—"

"খুসী ত হবেনই। আপনার মতগুলি যেরূপ উদার, ভাষাও তেমনি স্বাধীন। আমি ভাবছি যে যদি আজ আপনাকে আপনার কোনও বন্ধু আমার সঙ্গে এরূপ ভাবে পাশাপাশি ভ্রমণ করতে দেখেন, তা হলে—"

আমি মাঝে একটু চক্ষু চাহিয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যাসন্ন কোনও বন্ধুর সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। চোখ বুঝিবার আর একটি কারণও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য—গভীর চিন্তা। এখন আমি কি করি?

হঠাৎ মোটরের শব্দে চক্ষু চাহিলাম মনে করিলাম এতক্ষণে ট্যাক্সি মিলিল। কিন্তু দেখিলাম প্রাইভেট্ কার। তখন আবার চক্ষু মুদ্রিত করিবার জোগাড় করিতেছি, এবং মস্তিষ্কে পূর্ব্ব সঞ্চিত নস্যের আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ গতিকে একটি অবশ্যম্ভাবী হাঁচির প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় নাকের ঠিক ডগাটির উপর এমন একটি প্রচণ্ড ঘুষি পড়িল যে যুগপৎ হাঁচি অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল

এবং তার বদলে নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত নির্গত হইল। প্রহার-কর্ত্তাকে দেখিয়া লইবার সুযোগ হওয়ার পূর্ব্বেই আমি ভূমিতলগত হইলাম এবং কোন্ ধারা অনুসারে এইরূপ আক্রমণ দণ্ডনীয় তাহা এক মুহূর্ত্তে চিন্তা করিয়া লইলাম। পরক্ষণেই উঠিয়া দেখিলাম একজন সাহেব মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্‌ট্‌কে টানিতে টানিতে মোটরে উঠাইয়া লইয়া চম্পট দিল।

তখন হিতোপদেশের বচনের সত্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না:—পথি নারী বিবর্জ্জিতা। হিতোপদেশে বা বিষ্ণুপুরাণে বচনটি আছে, ঠিক স্মরণ হয় না; তবে বচনটি অমূল্য!

কিছুদিন পর্য্যন্ত টাইপ করানো স্থগিত রহিল। পরে আফিসে গিয়া শুনিলাম মেমসাহেব চাকরীতে এস্তফা দিয়াছে। সে মাসের শেষভাগে মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্‌টের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। জে, সির মোটরে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া ত অবাক! যে পাষণ্ড আমাকে সেদিন পথে অসহায় অবস্থায় পাইয়া ঘুষি মারিয়াছিল, মেমসাহেব তাহাকেই বরমাল্য দিয়া বসিয়াছেন! আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিব ভাবিতেছি, এমন সময় সেই গুণ্ডাকার তথাকথিত বর আমার কর পেষণ করিয়া বলিল, "সেদিন আমার ভুল হয়েছিল, মাফ করবেন।"

মিস্ ভ্যাণ্ডারবিলট্ ওরফে মিসেস্ টম্‌টাংডন বলিলেন, "ওঁর দোষ নেই। সেদিন উনি প্রথম মেসপট্ থেকে এলেন। অফিসে

যাচ্ছিলেন আমার খোঁজ কর্‌তে। আমি 'কলিকের' ব্যথায় আপনার সঙ্গে আসছিলাম, তা উনি আদপেই বুঝতে পারেন নি। বুঝেছেন, মিষ্টার বটব্যাল্‌; আপনি কিছু মনে করবেন না!"

আমি ভাবিলাম যত আহম্মকের দিন ১লা এপ্রিল। ঐ দিন ওঁর মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে আসা ভাল হয় নাই।

ভক্তের ভগবান্

১

অমরকেতন সেকালের এক মস্তবড় রাজা। ধনদৌলত, হাতীঘোড়া, সৈন্যসামন্ত—কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। তবু কিন্তু তাঁহাকে একদিনের তরেও রাজকাজে অবহেলা করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যের কোথাও অশান্তি ছিল না—প্রজারা পরমসুখে কাল কাটাইয়া দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত।

রাজার একটি উপযুক্ত মন্ত্রী ছিলেন, নাম তাহার ইন্দ্রকেতু—তাঁহার মত বিশ্বাসী বিচক্ষণ লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা যে রাজ্যশাসন খুব ভাল করিয়া করিতে পারিতেন, রাজকাজে যে তাঁহার ভুলচুক হইত না, তাহার কারণ এই মন্ত্রী। মন্ত্রীই সবকাজে তাঁহাকে বুদ্ধি জোগাইতেন।

ইন্দ্রকেতু রাজার কাজ প্রাণপণ করিয়াই করিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ভক্তিনিষ্ঠায় কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না। ইন্দ্র-কেতুর ইষ্টদেবতা—রামচন্দ্র। তাঁহার পূজা না করিয়া তিনি কখনও জলস্পর্শ করিতেন না। ইন্দ্রকেতু সকাল বেলা উঠিয়া সকাল বেলার আহ্নিক সারিতেন, তাহার পর যাইতেন রাজ-

সভায়। দুপুরে আবার ঘরে ফিরিয়া স্নানান্তে একমনে ইষ্টদেবতার পূজা করিতেন। রাজার কাজেই বেশি সময় যাইত, জপতপ করিবার সময় ছিল অল্প; কাজেই পূজার সময় কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করে, ইহা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না।

একদিন রাজা সিংহাসনে বসিয়া আছেন, পাশেই মন্ত্রী; পাত্রমিত্র সেপাইশান্ত্রীতে রাজসভা গমগম করিতেছে। এমন সময় রাজ্যের সেরা মণিকার একটি মূল্যবান্ হার লইয়া রাজার কাছে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, নানা দেশ হইতে নানা রকম সুন্দর সুন্দর দামী মণিমুক্তা আনিয়া এই হারটি আমি যত্ন করিয়া গড়িয়াছি। ইহার দাম এক লক্ষ মোহর। মহারাণীর জন্য এই হারটি আপনি কিনিয়া রাখুন—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

দেখা মাত্রই হারটি রাজার পছন্দ হইয়াছিল,—কিনিতে তাঁহার আপত্তি হইল না। কিন্তু মূল্যটা উপস্থিত তিনি মণিকারকে দিলেন না, বিবেচনা করিয়া পরে দেওয়া যাইবে বলিয়া হারটি তুলিয়া রাখিবার জন্য মন্ত্রীর হাতে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সভা ভঙ্গ হইল।

২

বেলা দ্বিপ্রহর। রাজা অন্তঃপুরে আহারে বসিয়াছেন, রাণী তাঁহাকে আদর করিয়া খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিলেন, "মহারাজ, শুনিলাম একটি সুন্দর হার আপনি কিনিয়াছেন—হারটি একবার আমি দেখিতে পাই না কি?"

রাজা বলিলেন, "হারটি তো তোমারই মহিষী, কেন তুমি দেখিতে পাইবে না? তবে দামটা এখনও দেওয়া হয় নাই বলিয়া উহা তুলিয়া রাখিতে দিয়াছি। দাম চুকাইয়া দিলেই তোমার হার তোমার কাছে আসিবে।"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আমি তো হার এখনি গলায় পরিতে চাহিতেছি না, শুধু একবারটি দেখিতে চাই। দেখিয়াই তোমার হার আবার তোমাকে আমি ফিরাইয়া দিব।"

রাজা বলিলেন, "কিন্তু হারটি তো এখন পাইবার উপায় নাই, মহিষী; সে হার আমি মন্ত্রীকে তুলিয়া রাখিতে দিয়াছি। মন্ত্রী ফিরিয়া না আসিলে সে হার তোমাকে আমি কিরূপে দেখাই?"

রাণী বলিলেন, "ফিরিয়া আসিতে আর কতক্ষণ! একবারটি তাঁহাকে তুমি ডাকিয়া পাঠাও না!"

রাজা বলিলেন, "মন্ত্রী এই সবে রাজসভা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তারপর এখন সবারই নাওয়া খাওয়ার সময়। এখন কাহাকেও ডাকিতে আছে কি? আর খানিকটা সবুর করো রাণী,—বেলা একটু পড়িলেই তিনি রাজবাড়ীতে আসিবেন।"

রাণী বলিলেন, "রোজ রোজ তো আর তাঁহাকে এমন সময় আসিতে বলা হয় না। হঠাৎ একদিন যে দরকার পড়িলে তাঁহাকে ডাকা যাইবে না—সেই বা কি কথা! তিনিই তো রাজার চাকর—রাজা তো আর তাঁহার চাকর নহেন।"

রাজা দেখিলেন, রাণীর যে রকম জিদ তাহাতে তিনি হার না দেখিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। করেন কি? ইন্দ্রকেতুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তখনি লোক পাঠাইলেন।

মহারাজ অমরকেতনের লোক মন্ত্রী ইন্দ্রকেতুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার দারোয়ানদের বলিল, "তোমাদের মনিবকে শীঘ্র খবর দাও—মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

মন্ত্রীর দারোয়ানেরা বলিল, "তিনি ঠাকুরপূজা করিতেছেন। একটু দেরি করিতে হইবে—পূজা শেষ হইলেই তাঁহাকে আমরা খবর দিব।"

রাজার লোকেরা চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আমরা রাজার লোক—রাজার হুকুম লইয়া আসিয়াছি, এক মুহূর্ত্তও দেরি করিতে পারি না। তোমরা মন্ত্রী মহাশয়কে খবর দিবে কি না বল।"

দারোয়ানেরা বলিল, "বলিয়াছি তো দিব—পূজা শেষ হইলেই তাঁহাকে আমরা খবর দিব। পূজা শেষ হইবার আগে তাঁহার কাছে কাহারও যাইবার হুকুম নাই।"

রাজার লোকেরা রাগে অধীর হইয়া উঠিল—"কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! রাজার হুকুমও তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেছ না! ভাল, তোমরা তোমাদের মনিবকে খবর দিতে ভয় পাও—আমরাই যাইতেছি খবর দিতে।" এই বলিয়া তাহারা ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল।

দারোয়ানেরা তাহাদের পথ আগলাইয়া হাত জোড় করিয়া

বলিল, "মাফ করিতে হইবে, ভিতরে যাইবার হুকুম নাই। আমাদের দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিতেও ভিতরে যাইয়া তোমা-দিগকে তাঁহার পূজার ব্যাঘাত করিতে দিব না।"

রাজার লোকেরা দেখিল গতিক বড় সুবিধার নয়। তাই তাহারা বিবাদ না করিয়া রাজবাড়ীতে খবর দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিল। কিন্তু যাইবার সময় আকারে প্রকারে এবং কথায় জানাইয়া গেল যে, ইহার শাস্তি উত্তমরূপেই ভোগ করিতে হইবে!

মন্ত্রীর বাড়ীর দরজায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, রাজার লোকেরা রাজবাড়ীতে গিয়া সে সব কথা এমন রঙ্ ফলাইয়া বলিল যে, রাণী তো চটিয়াই আগুন! রাজাও ঠাণ্ডা থাকিতে পারিলেন না; মন্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য তখনই তিন শত ঘোড়সওয়ার পাঠাইলেন। আকাশে ধূলা উড়াইয়া যোদ্ধারা দেখিতে দেখিতে মন্ত্রীর বাড়ীর কাছে গিয়া হাজির হইল! কিন্তু হরি! হরি! একি!—মন্ত্রীর বাড়ীর দরজায় যে সৈন্য গিস্ গিস্ করিতেছে! এত সৈন্য মন্ত্রী মহাশয় কোথায় পাইলেন! রাজার সৈন্যেরা সভয়ে দেখিল যেমন লম্বা চওড়া ঐ সব সৈন্যের চেহারা, তেমনি জমকালো তাহাদের সাজগোজ! গায়ের রঙ নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম, ঘাড়ে তূণ, হাতে তীরধনুক! প্রথমে সৈন্যেরা গেল উত্তর দরজার দিকে, সেদিক দিয়া তাহাদের মাথা গলাইবার ভরসা হইল না। সেখান হইতে ঘুরিয়া তাহারা দক্ষিণ দরজার দিকে গেল—গিয়া দেখে সেখানেও

ঐরূপ সৈন্যের ভিড়! ভয়ে তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল, হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল! ঐরূপ অদ্ভুত সেনাদলের কাছে দাঁড়াইয়া থাকা মোটেই সুবিধার কাজ নহে মনে করিয়া, তাহারা সেখান হইতে চট পট ছুটিয়া পলাইল।

ততক্ষণে ইন্দ্রকেতুর পূজা শেষ হইয়াছিল; দারোয়ানেরা এইবার তাঁহার কাছে গিয়া রাজবাড়ীর লোকদের ব্যবহারের কথা বলিল; আর ইহাও জানাইল যে, রাজার লোকেরা যাইবার পর, রাজবাড়ীর দিক হইতে একদল ঘোড়-সওয়ারও আসিয়াছিল, আসিয়াই ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা কেন আসিল, আর কেনই বা ফিরিয়া গেল—দারোয়ানেরা সে কথা কিছুই বলিতে পারিল না।

কথা শুনিয়া ইন্দ্রকেতুর ভাবনা হইল—আর কিছুর জন্য নয়—বুঝি বা রাজবাড়ীর কোনো অমঙ্গল হইয়াছে ইহা মনে করিয়া। তেমন কিছু না হইলে ওদিক হইতে ঘোড়সওয়ার আসে কেন? মন্ত্রীর আর আহার করা হইল না, তিনি ভাবিতে ভাবিতে রাজবাড়ীতে গেলেন। রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি পূজা করিতে বসিয়াছিলাম, তাই আমার আসিতে একটু দেরি হইয়াছে। আমাকে খবর দেওয়া লইয়া শুনিলাম আমার নির্ব্বোধ দারোয়ানেরা আপনার লোকদের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছে—এ জন্য আমি খুব লজ্জিত। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "অপরাধ

তোমার নয় মন্ত্রী, আমার। তুমিই আমাকে ক্ষমা করিবে। সভা-ভঙ্গের পর, আমি অন্তঃপুরে আসিলে মহারাণী সেই হারছড়াটি দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধেই তোমাকে অসময়ে ডাকিতে পাঠাই। আমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল মন্ত্রী, তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত করা।"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "না না অন্যায় কিছুই হয় নাই। হার দেখিতে চাওয়া তো রাণীমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কোষাগারে হার তুলিয়া রাখিয়াছিলাম—কোষাগারের চাবি আমার সঙ্গেই আছে।—কিন্তু মহারাজ, আমায় ক্ষমা করিবেন, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, রাজবাড়ী হইতে কি কোনও ফৌজ আমার বাড়ীর দিকে গিয়াছিল?"

রাজা বলিলেন, "সে দোষও আমার! আমিই সিপাহিদের কথায় উত্তেজিত হইয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের মত তোমাকে ধরিয়া আনিবার জন্য, তোমার বাড়ীতে ঘোড়সওয়ার পাঠাইয়াছিলাম।"

ইন্দ্রকেতু অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি একজন প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী। রাজ সংসারের উন্নতির মূল তিনিই। তাঁহাকে ধরিবার জন্য রাজা সৈন্য পাঠাইবেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর।

তিনি শুধু বলিলেন, "আমি ত ইহার কিছুই জানি না—কি আশ্চর্য্য!"

রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পরে কি হইয়াছে, তাহাও কি তুমি জান না?"

"না মহারাজ, আমায় ত কেহই কিছু বলে নাই। রাজবাড়ীর তলব শুনিয়া, আমি তখনি চলিয়া আসিয়াছি।"

"তবে আমিই বলিতেছি শোন। তোমার বাড়ীতে অনেক তীরন্দাজ জড় হইয়াছে দেখিয়া আমার সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়াছে। তুমি অত সৈন্য কোথায় পাইলে মন্ত্রী?"

"সে কি মহারাজ, আমি সৈন্য কোথায় পাইব? আপনার লোকেরা নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিয়াছে।"

"মিথ্যা নয় মন্ত্রী—মিথ্যা নয়—অতি সত্য। তোমার বাড়ীর উত্তর, দক্ষিণ সব দরজায় অগুন্তি সৈন্য পাহারা দেয়।"

ইন্দ্রকেতু কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন—"সে আবার সাধারণ সৈন্য নয়। তাহারা এক একজন যমদূতের মত দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ; প্রত্যেকের হাতে তীরধনুক; প্রত্যেকের বর্ণ নবদুর্ব্বাদলের মত শ্যাম। তাহারা কা'রা মন্ত্রী?"

মন্ত্রী প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন না, 'নবদুর্ব্বাদলশ্যাম, হাতে তীর-ধনুক' এই কথা শুনিয়া তাঁহার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি চক্ষু মুদিয়া দেখিতে লাগিলেন,—

রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং

আর ভক্তিগদগদ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্।

তাঁহার দুই চোখ জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সব সৈন্য কাহারা মন্ত্রী?"

মন্ত্রী প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়া, কোষাগারের চাবি রাজার পায়ের নিকটে রাখিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আজ হইতে আমার ছুটী। আমি আর চাকরী করিব না। আমি আপনার পিতার আমল হইতে কাজ করিতেছি। দিনরাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময় রাজবাড়ীতেই কাটাই। গৃহে গিয়াও আমার মন রাজ্যের কল্যাণ-চিন্তায়ই নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট সময় আহার নিদ্রা আমোদে কাটিয়া যায়। ইষ্টদেবের আরাধনা করিবার অবসর পাই কোথায়? ষাট দণ্ডের মধ্যে একদণ্ডও তাঁহার চিন্তা করি কিনা সন্দেহ। বড় অভিমান ছিল মনে যে, আমি রাজার বড় প্রভুভক্ত প্রাচীন ভৃত্য; আমার সে অভিমান আজ ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গিয়াছে। প্রভু বলিয়া এতদিন যাঁহার সেবা করিলাম, তিনি আমার একটু বিলম্ব ক্ষমা করিতে পারিলেন না; আমাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য ফৌজ পাঠাইলেন। আর যাঁহার সেবা করিতে এতদিন অবহেলা করিয়াই আসিয়াছি, সেই বিপদের বন্ধু প্রভু রঘুনাথ আমার, নিজে তীরধনুক লইয়া আমাকে রক্ষা করিতে আসিলেন! আজ হইতে দাসত্ব করি তো তাঁহারই করিব—আর কাহারও নয়! মহারাজ, আমায় বিদায় দিন।"

এই বলিয়া মন্ত্রী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন; রাজা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্. এ প্রণীত

কয়েকখানি গ্রন্থ :—

রা

ছোট গল্প সাহিত্যে অতুলনীয়। ইহাতে আছে 'নীলাম্বরী', 'প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী', 'ঘুমের পাহাড়', 'হতভাগ্য', 'বাঁশীচোর', প্রভৃতি। ইহার সকলগুলি গল্পই বঙ্গদর্শন, মানসী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্য্যাবর্ত্তে', রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন 'মানসী'তে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'বসুমতী'তে সুবিস্তৃত সমালোচনা করিয়া গল্পগুলির উচ্চপ্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেকটি গল্প করুণরসের স্নিগ্ধ প্রবাহে আপ্লুত। "বাঁশীচোর" গল্পে ভক্তিরসের যে মধুর ধারাটি বহিয়াছে, তাহার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল। মূল্য বার আনা।

প্রকাশক :

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

কানের দুল

এই গল্প সপ্তকে যে গল্পগুলি আছে, তাহা অতি উপভোগ্য। 'কানের দুল', প্রতিদান', 'কোণ্ডার সাহেব', 'বিদেশী' প্রভৃতি গল্প-সাহিত্যে তুলনা-বিহীন। সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, "কানের দুলে হীরার জলুষ আছে।" (ভারতবর্ষ) 'প্রবাসী', 'মানসী', প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র সমূহে উচ্চ প্রশংসিত। অ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত ; সুন্দর সিল্কের বাঁধাই ; উপহার দিবার পক্ষে মনোজ্ঞ।

মূল্য দেড় টাকা।